সেই সোনালী দিনগুলি

আজাহার হোসেন

সেই সোনালী দিনগুলি

আজহার হোসেন

ঢাকা

১৯৮৫ সন

প্রকাশক : ইলিয়াস বালাগাম ওয়ালা
ইলিয়াস প্রকাশন।
মারভানজী কান্দাওয়ালা রোড
গান্ধী গার্ডেন, করাচী
পাকিস্তান।

গ্রন্থসত্ব : গ্রন্থকারের

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৫ সন

প্রচ্ছদ : শচীন্দ্রলাল বড়ুয়া

মুদ্রাক্ষরিক : এ, কে, এম, সামছুল আলম

মুদ্রণে : এম, এ, লতিফ
দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩/৪, পাটুয়াটুলী লেন
ঢাকা-১, বাংলাদেশ

মূল্য : ৩০'০০ টাকা

লেখকের অন্যান্য রচনা :

১। Men & Matters

২। Essays Unplasant

৩। Comic Creations of Shakespeare

৪। Road to the Enchanted Island (যন্ত্রস্থ)

উৎসর্গ

জান্নাতবাসী মা ও বাবা
(বেগম খায়রুন্নেছা ও মৌলভী আবুল হোসেন)
যাঁরা আমাকে জীবনের সব কাজে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন।

আজহার হোসেন
১৮ই অক্টোবর, ১৯৮৫ সন
ঢাকা।

সূচীপত্র

ভূমিকা

"সোনালী দিন" আর যাই হোক এমন কোন সোনালী দিন বা স্বপন পুরীর কাহিনী নয় কিংবা আমার আত্ম জীবনীও নয়। এ'টা সামান্য স্মৃতি-চারণ মাত্র। ত্রিশের দশক থেকে বর্তমান পর্য্যন্ত নানান ঘটনা ও পরিবেশ আমার মনে যে ছাপ রেখেছে, তারই একটা অসম্পূর্ণ কাহিনী। একজনের মনে ঠিক যে ছাপটি পড়ে অপরের মনে একই ঘটনায় তেমনটি না-ও পড়তে পারে, ছাপের আকৃতিতে তারতম্য ঘটলেও প্রকৃতিতে খুব বেশী প্রভেদ বোধ করি ঘটে না। একই ঘটনা দু'জনার মনে দু'রকমে প্রতিফলিত হতে পারে এবং হয়েও থাকে। তাতে ঘটনার বিশেষ কোন অঙ্গহানি হয় না, কারণ ঘটনা একটা সত্য কিন্তু রূপান্তরিত হয় একটা বিশেষ মানসিতার মাধ্যমে।

এতে ঘটনাবলীর সাথে কিছু চরিত্র এসেছে, যাদেরকে অত্যন্ত নিকট থেকে আমি দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এতে দু এক জন এমন আছেন, যাঁরা অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু তাঁদের মধ্যেও মাঝে মাঝে অসাধারণত্বের আলোক দেখেছি। বাইরের পাঠকদের এ'টি মন্দ লাগার কথা নয়। এ' রচনায় যদি কিছু অপ্রীতিকর বিষয় থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার নিজের।

এই স্মৃতিচারণে আমার বিগত দিনের ডায়রীগুলো থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। যে ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ নেই, তা নিছক স্মৃতির ওপর নির্ভর করে লিখেছি, এতে যৎসামান্য ঘটনার হের-ফের হতে পারে, তবে ঘটনার ধারা বাহিকতায় এর ছাপ পড়েনি।

শেষ অধ্যায়ে (খাতার শেষ পাতা) আমি কোন ধারাবাহিকতা বজায় রাখিনি, স্মৃতির কোঠায় যে ভাবে যা সঞ্চিত তা ঠিক সেই ভাবেই উপ-স্থাপন করেছি এবং এতে স্মৃতিচারণের তেমন কোন অঙ্গহানি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

পরিশেষে এই রচনায় আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মী যাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৮৫ সন।

আজহার হোসেন
অধ্যাপক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,
সাভার, ঢাকা।
বাংলাদেশ।

স্কুলে যখন পড়ি

ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় ১৯৩৫ সনের ফেব্রুয়ারী কি মার্চ মাসে ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত (East Bengal Institution-এ Class VI)-এ ভর্তি হই। তখনকার ঢাকা আর আজকের ঢাকার মধ্যে যে পার্থক্য তা সহজে বোঝান সম্ভব নয়। ঢাকা শহরটা ছিল একটা ছোট মফস্বল শহর--একটা University Town এবং এই University কে কেন্দ্র করেই ছিল ঢাকার সংস্কৃতিক ও শহুরে জীবন। শহরে জনসংখ্যা লাখ খানেকের বেশী হবে না এবং নবাবপুর লেভেল ক্রসিং পার হলেই একেবারে শহরের বাইরে চলে যাওয়া যেত। মনে আছে, সেই সময়ে রাজা পঞ্চম জর্জের সিলভার জুবিলি হয়েছিল এবং এই উৎসবকে কেন্দ্র করে অনেক খেলাধূলা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল স্কুলে। আমরা স্কুল থেকে রুট মার্চ করে নবাবপুর রোড ধরে ঢাকা ইন্টার-মিডিয়েট কলেজ বিল্ডিংয়ের (যা বর্তমান পুরাতন হাইকোর্ট) মাঠে জমায়েত হয়েছিলাম আতস বাজির খেলা দেখতে। কি রংগীন সমারোহ। কত রকমের আতসবাজি পোড়ান হয়েছিল তার ঠিক নেই। শেষ পর্যন্ত দু'টো আতস বাজির জাহাজে যুদ্ধ দেখান হয়েছিল। একটা জাহাজ পরাজিত হয়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল ও অন্য একটা জাহাজে রাজা ও রাণীর (পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর) রঙ্গীন প্রতিকৃতি ভেসে উঠল। মনে পড়ছে কি অদ্ভুত উম্মাদনা নিয়ে আমরা সেই দৃশ্য উপভোগ করি।

আমাদের স্কুল বিল্ডিংটা ঠিক বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়েই বলা যেতে পারে এবং এখনও সেখানেই। পুরান আমলের Manor House Pattern এর অনেক কামরা বিশিষ্ট দুইতালা বাড়ী, কার্পেট মোড়ান দামী কাঠের সিঁড়ি ও অনেক উঁচু Ceiling। হিন্দু ও ব্রাহ্ম শিক্ষকের সংখ্যাই তখন প্রায় সব তবে দুই তিন জন মুসলমান শিক্ষকও ছিলেন ওর মধ্যে আমার বড় মামা একজন যিনি আরবী ও পারসী ভাষার শিক্ষক ছিলেন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন যোগজীবন পাল; তাঁর আদেশক্রমে আমাদের first Period এ একটা ব্রাহ্ম সঙ্গীত গাওয়ার পর প্রার্থনা করে ক্লাসের পড়া শুরু করতে হোত। ভালই লাগত গানের পরে ক্লাস। এতে মুসলমান, খৃষ্টান বা হিন্দু ছাত্রদের বা তাদের অভিভাবকদের তরফ থেকে কখনও কোন প্রতিবাদ হতে দেখেনি। আমরা আনন্দই পেতাম। ইংরাজি পড়াতেন ধীরেন দাস। মন্দ পড়াতেন না। তবে জামা কাপড়ে তেমন রুচিশীল ছিলেন না। মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত ইংরাজি বলতেন যার মর্ম্ম অনেক দিন পড়ে বুঝেছি। Home work সম্বন্ধে

বলতেন "Have you brought your home work-To day? Not brought? All right brought tomorrow, brought tomorrw" যোগেশ রাউথ বাংলা পড়াতেন। তবে জীতেন মজুমদার ইতিহাস অতি উত্তম পড়াতেন এবং পাটুয়াটুলী-কে "পাউটাটুলী" বলতেন। জীতেন মজুমদার অনেক দিন ঢাকায় ছিলেন—১৯৪৮ এর দিকে ভারতে চলে যান। আমাদের স্কুল এর ঠিক পশ্চিমে একেবারে মুখোমুখি ছিল End Girls School যেটা বর্তমানে নেই এবং সেই জায়গায় বিরাট Second hand cloth market ও cut piece market হয়েছে। ভারী সুন্দর দালান ছিল ওটা। চারদিকে উঁচু প্রাচীর ও বনানী দিয়ে ঘেড়া, মাঝে একটা বাগান ও বড় পুকুর। মেয়েদের স্কুলের জন্য আদর্শ জায়গা। আমাদের স্কুলের কিছুটা সামনে প্রায় নদীর ধারেই সেই ঐতিহাসিক "কালু ঝম ঝম" কামান-টা ছিল—যা বর্তমানে ওসমানী উদ্যানে শোভা পাচ্ছে। শনিবার সন্ধ্যায় অনেক হিন্দু মেয়েকে কামানের মুখে সিঁদুর মাখতে দেখেছি।

তখনকার ঢাকায় উৎসবের অন্তছিলনা। শ্রাবন-ভাদ্র মাসে ঢাকায় বিখ্যাত জন্মস্টমীর মিছিল হোত। যদিও এই উৎসব ছিল প্রধানতঃ হিন্দু-দের তবুও এতে অনেক মুসলমান অংশগ্রহণ করত এবং ভারতের নানান জায়গা থেকে ঢাকায় লোক সমাগম হোত। মিছিল দুদিন হোত। একদিন ইসলামপুরের অন্যদিন নবাবপুরের। নবাবপুরের মিছিল—নবাবপুর রোড ধরে বেরিয়ে জগন্নাথ কলেজের কাছ দিয়ে বাংলা বাজার হয়ে আবার নবাব-পুরের দিকে শেষ হতো। এই মিছিলের প্রধান উদ্দোক্তারা প্রধানতঃ নবাবপুর এলাকার বাসিন্দা। এই এলাকার ধনী বসাকেরা প্রায় সবই এর ব্যয়ভার বহন করতেন। এদের মধ্যে মদন মোহন বসাক ছিলেন অন্যতম। এই বসাকদের পরিবারের একজন আমার সাথে পড়ত, তার নাম ননী গোপাল বসাক, তার মেয়ে ঝর্ণা বসাক। "শাবনাম" নামে পরে ছবিতে অভিনয় করে। অনেক নাম করে ছিল। ইসলামপুরের মিছিল—নয়া বাজার দিয়ে আরমানি-টোলার মাঠ ঘুরে ইসলামপুর রোড দিয়ে বাংলা বাজারের দিকে যেয়ে শেষ হোত। এই মিছিল দুটোর বিষয় বস্তু হোত শ্রী কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন দিক। তার জন্ম, রাশলীলা, বস্ত্র হরণ, দৈত্য দানবের সাথে যুদ্ধ, কালীয় নাগ দমন ইত্যাদি। বড় বড় চাকা লাগান কাঠের platform এর ওপর সাজান এক একটা দৃশ্য এবং সেইগুলো টানা হোত—অনেক-টা Stage on wheels এর মত। Carbide গ্যাসের আলোতে ঝলমল করে উঠত এই সব

সুসজ্জিত চলয়মান দৃশ্য। নানান রকমের সাজসজ্জা করে গোপ-গোপিনীর বেশ কয়েকটা দলও থাকত। জন্মাষ্টমীর মিছিলের পরের দিন একটা fixed stage তৈরী করে (বর্তমান বাংলা বাজার girls school এর কাছাকাছি জায়-গায়।) শ্রীকৃষ্ণের জীবন থেকে নানা রকমের ঘটনার রূপ দেয়া হোত। চমৎকার অভিনেতা সব। কি নিখুঁত শিল্পী, তন্ময় হয়ে আমরা দেখেছি। এই মিছিল দুটোর মধ্যে কিছু কিছু ব্যঙ্গ কৌতুকের দৃশ্যও থাকত আর থাকত অনেক ঘোড় সওয়ার। কয়েকটা হাতী ও বেরুত এই সব মিছিলের সাথে।

সেই সময়ে ঢাকা শহরে দোকান পাট তেমন বেশী ছিলনা। তবে অভি-জাত দোকানের মধ্যে ছিল নবাব গেইটে হামিদের দোকান, বংশী বাজারে সংভির দোকান, নবাবপুরে অমৃত লাল পালের দোকান, পাটুয়াটুলিতে যতীনের দোকান, পি, কে বসাকদের আলোক সজ্জার দোকান, ইসলামপুরে নগর বাসী সুরের দোকান, ওয়াইজ ঘাটে ফেক্‌টো রেডিওর দোকান। প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিষই ঐসব দোকানে পাওয়া যেত। ঢাকা শহরে হিন্দু মুসলমানেরই প্রাধান্য ছিল, তবে কিছু খৃষ্টান ও ইউরোপিও বাসিন্দারাও ছিলেন। মুসলমানেরা প্রায়ই গরীব ও হিন্দুদের মধ্যে আথিক স্বচ্ছলতা ছিল। শহরের কতকগুলো অঞ্চল হিন্দু প্রধান ও কিছু অঞ্চল মুসলমান প্রধান ছিল। চকবাজার গির্দ্দা, উর্দ্দু, লালবাগ, শোয়ারীঘাট, ইসলামপুর, রোকনপুর এবং ছোট ছোট বেশ কিছু মহল্লা মুসলমান প্রধান ছিল। উয়ারি, দিগ বাজার, কায়েতটুলি, সুত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া অঞ্চলগুলো হিন্দু প্রধান ছিল। তবে শাখারী বাজার ও তাঁতিবাজার-এ একচেটিয়া হিন্দু কারিগরেরা বসবাস করত শহরের বেশ কিছু অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশেই থাকত।

শহরের রাজনীতিক জীবন বর্তমানের মত না হলেও বেশ জীবন্ত ও চঞ্চল ছিল। কোলকাতা কিংবা অন্য কোন বড় শহর থেকে রাজনৈতিক নেতারা মাঝে মাঝে আসতেন। তাদেরকে কেন্দ্র করে বেশ চাঞ্চলতার সাড়া পড়ে যেত। যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৭ সনেই একবার সুবাস বোস ঢাকায় এসেছিলেন এবং সদর ঘাটে কর্ণেসণ পার্কে তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। ঢাকায় কোন দৈনিক পত্রিকা ছিল না। কোলকাতা থেকে অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, Statesman একদিন পরে শহরে এসে পৌঁছত, ঢাকার কয়েকটা পুরান সপ্তাহিকের কথা মনে পড়ে, একটার নাম "চাবুক" এবং অন্যটা "সোনার বাংলা" আর একটা সপ্তাহিক কাগজ ছিল তার নাম

"বাংলার রূপ" ঐ কাগজে ভাওয়াল সন্যাসির মামলার কথা উঠত মনে আছে, যা জনসাধারণ বড় আগ্রহের সাথে পড়ত।

ভাওয়াল সন্যাসির মামলার কথা মনে হতে একটা দুইটা বিছিন্ন ঘটনা মনে পড়ছে। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। ভাওয়াল সন্যাসির গল্প নিয়ে অনেক কবিতা ও ছড়া রচিত হয়েছিল যা পথে ঘাটে অনেকের মুখে শুনা যেত। চানাচুর কিংবা দাদের মলম বিক্রেতাও মধ্যম কুমার, সত্তু ডাক্তার ও রাণীর এইসব মুখরোচক কবিতা ও গান গেয়ে লোক জমায়েত করত। ভাওয়াল মামলা ১৯৩৭।৩৮এর দিকে ঢাকা কোর্টে চলেছিল। এবং মনে পড়ে পয়সার লোভে অনেক লোক হয় রাণী নয় মধ্যম কুমারের পক্ষে স্বাক্ষী দিত। আমাদের এক পরিচিত দর্জি স্বাক্ষী দিয়েছিল কুমারের পক্ষ হয়ে। ব্যারিস্টার বি, সি, চার্টাজি জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কত টাকা খেয়ে সাক্ষী দিতে এসেছেন?"

পরহেজগার দর্জির জবাব

"বেশী না হুজুর মাত্র ২০ টাকা, রাজা জিতলে অরোও ১০ টাকা পামু"। আপনি কুমার ও রাণী মা-কে কি কখনও রাজ বাড়ীতে দেখেছেন?

"কইতে পারিনা। তবে দেখছি বইলা মনে পড়ে। লম্বা গড়ন, সুন্দর পাতলা হইল গিয়া আমাগোর রাণী মা আর কুমার হইল গিয়া মোটা তবে হেয় সুন্দর—দূর থাইকা দেখছি"।

এই সব প্রহসন ভাওয়াল মামলার প্রায়ই হোত।

ঢাকায় মাঝে মাঝে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি সম্মেলন হোত। মনে আছে বোধ হয় ১৯৩৭ সনে একবার শরৎচন্দ্র ঢাকায় আসেন। তিনি জগন্নাথ হলে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা বুঝার বয়স তখন আমার হয়নি। তবে পেছনের সারিতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মশার যন্ত্রনায় কাবু হয়ে একজন বৃদ্ধ লোকের তাম্রকুট সেবন রত ছবি মনে এঁকে বাড়ী ফিরছিলাম। বিখ্যাত নৃত্য শিল্প উদয় শংকরও ঐ সময়ে একবার ঢাকা আসেন। ঢাকার রূপ-মহল সিনেমা হাউজে (সদর ঘাটে) সেই অনুষ্ঠান হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও তিমির বরণ। মনে আছে বাবার সাথে সেই অনুষ্ঠান দেখে অনেক রাত করে বাড়ী ফিরেছিলাম।

ঢাকার সদর ঘাটের কামানের কথা বলেছি। সদর ঘাটের কথা মনে হতেই অনেক কথা মনে পড়ছে। আজকের সদর ঘাটের সাথে তখনকার

সদর ঘাটের কোন মিলই নেই এক নাম ছাড়া। বাদামতলী থেকে লালকুটি পর্যন্ত নদীর পাড়ের যে বাঁধান পথ তার নাম "বাকলেণ্ড বাঁধ"। ভোরে-- বিকেলে সৌখিন লোকেরা হাওয়া খেতে বাঁধের ওপরে পায়চারি করতেন। বাঁধের ওপর কোন দোকান পাট ছিলনা। মাঝে মাঝে কংক্রিটের বসবার আসন ছিল, তাতে বয়স্ক লোকেরা বসে গল্প গুজব করতেন। বাঁধের সংলগ্ন নদীর তীরে বেশ কয়েকটা বাঁধান পাকা ঘাট ছিল। ওতে লেগে থাক্‌ত স্নানার্থীদের ভিড়। ভোর-বিকেল সন্ধ্যা কোন সময়েই বাদ যেত না। নিকট-বর্তী মহল্লা থেকে কিছু প্রমোদ বালারাও ভোর বেলায় স্নান করতে ঐ সব ঘাটে আসত এবং সেই জন্য ভোর বেলায় বায়ু সেবনকারির ভিড় একটু বেশী হোত। আর থাক্‌ত নদীতে বড় বড় পানসি নৌকা বা বজরা যাতে গণ্যমান্য লোক সাময়িক ভাবে অবস্থান করতেন কারণ সেই সময়ে ঢাকায় কোন আবাসিক হোটেল ছিল না। একমাত্র আবাসিক হোটেল ছিল ও, কে, হোটেল "মুকুল" সিনেমার সঙ্গে, ঢাকা কোর্টের ঠিক উল্টাদিকে। বর্তমানে "মুকুল" সিনেমার নাম "আজাদ সিনেমা"। সদর ঘাটে দেখা যেত নানা জাতীয় ফল বিক্রেতা-ওয়ালাকে। বিক্রেতা বেশীর ভাগই মুসলমান ও ক্রেতা অকিধাংশ হিন্দু। বিক্রেতার গায়ে থাকত একটা ছেঁড়া গেঞ্জি ও পরণে লুঙ্গি আর ক্রেতার গায়ে থাকত ফিন ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে নিউকাট পেটেন্ট লেদার পামসু, হাতে ছড়ি।

সেই আমলের ঢাকায় এত রেস্টুরেন্ট বা খাবার ঘর ছিলনা। তবে খাবার দাবার তেমন অভাব ছিলনা। বিশেষ করে কয়েকটা এলাকায় প্রচুর মুখরোচক খাবার পাওয়া যেত।" "বাকরখানী" রুটি যা বর্তমানে একদম নাই বললেই চলে, অনেক জায়গায়ই পাওয়া যেত এটা যারা তৈরী করত, তাদের বেশীর ভাগেরই বাড়ী ছিল সিলেটে। মাটির মধ্যে গর্ত করা "তন্দুরে" এই রুটি "বেক" করা হোত ও দুটো লোহার কাঠি দিয়ে নিপুণ শিল্পীর মত ওটাকে নাড়া-চাড়া করে ঠিক সময়ে বার করত। সাইজ ভেদে রুটির নাম ছিল পাই, আধানি, ডবল। "তেহারী পোলাও" একটা সুস্বাদু খাবার। দু-আনা করে এক প্লেট বিক্রী হোত---বিশেষ করে চকবাজার ও লালবাগ অঞ্চলে। বর্তমান কালের বিরিয়ানীর এক পুরান তবে স্বাদে অতুলনীয় সংস্করণ। খাসীর গোস্ত, প্রচুর পেঁয়াজ ও মসল্লা মেখে পোলায়ের চাল দিয়ে তৈরী হোত এটা। একে তেহারি পোলাও বলা হোত কারণ কোন "তেহার" বা উৎসবে এটা রান্না করা হোত। মধ্যবিত্ত গরীবের ঘরে পোলাও রান্না একটা উৎসব এরই সামিল। প্রতিদিনই এটা ভোরের দিকে বিক্রী হোত।

বাকর খানি রুটির নামের উৎপত্তি ও বেশ চমকপ্রদ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঢাকায় একজন অভিজাত শ্রেণীর লোক বাস করতেন। তার নাম ছিল মির্জা আগা আবু বকর। তার পয়সা কড়ি প্রচুর ছিল, তবে স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। খেয়ে কিছু হজম করতে পারতেন না। তার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তার জন্য এক বিশেষ ধরণের রুটি সিলেট থেকে তৈরী করে আনা হোত। সিলেট অঞ্চলে খাবার কে "খানি" বলে। আবু বকর সাহেবের জন্য তৈরী রুটিকে "আবু বকরের খানি", পরবর্তীকালে সংক্ষেপে "বাকর খানি" হয়ে যায়। কথাটার পেছনে কিছু সত্য আছে বলে মনে হয়, কারণ ঢাকায় সেই আমলে বাকর খানি রুটির প্রস্তত কারক সবারই বাড়ী ছিল সিলেট জেলায়। এ-ছাড়া রোজ ভোর বেলা মাঝ বয়সী মেয়েরা পিঠা বিক্রী করতে আসত। নানা রকমের পিঠা। তারা পিঠা, লারুয়া বিস্কুট নানখাতাই ও ডিমের তৈরী একটা জিনিষ বিক্রী করত যাকে "মোকরাম" বলা হোত। মোকরাম এত হাল্কা হোত যে ৭/৮ খেলেও মনেই হোতনা যে কিছু খেয়েছি। তবে বেশ মিষ্টি ও সুস্বাদু ছিল এই মোকরাম। এইতো সে দিন অনেক বছর পর "বাইতুল মোকাররমের" এক অভিজাত কনফেকশনারীর দোকানে "মোকরাম" দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাস করে জানলাম যে ওটা তাদের পূর্ব পুরুষদের ফর্মুলা অনুযায়ী তৈরী এক বিশেষ ধরণের মিষ্টি। আমার চিনতে দেরী হলোনা। এ'যে ছোট সময়ে অনেক খেয়েছি। এক আনায় দুটো পাওয়া যেত। এখন দাম ২৫ টাকা ডজন। কে জানে সেই আমলের কোন এক গরীব হতভাগিনী পিঠা ওয়ালীর কোন এক ভাগ্যবান অধস্তন পুরুষ সেই বেতের ঝপুড়ির "মোকরম-কে" টেনে এনে সুসজ্জিত এয়ার কণ্ডিসন আলমারিতে এ রেখেছে। কেন জানিনা মনে হোল মানুষ আর মোকারমে তেমন প্রভেদ নেই। অনেক মানুষকেও দেখি বেতের ঝপুড়ি থেকে বেড়িয়ে সোজা মসনদে—তবে স্বাদে চেনা যায়--মোকরাম ও তাই।

ঢাকা শহরের আর একটা দিক ছিল "রমনার মাঠ" যে রেললাইনটি বর্তমানে নেই এবং যার ওপর দিয়ে রাস্তা বরাবর চলে গেছে নিউমার্কেট পেরিয়ে সেই রেল লাইনটি ছিল ঢাকা শহরের ডিভাইডিং লাইন। এক পাশে পুরান ঢাকা শহর ও অন্য পাশে রমনার মাঠ ও নতুন শহর, যেখানে কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (যা বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ) ঘোড় দৌঁড়ের মাঠ যা বর্তমানে সরওয়ার্দি উদ্যান ইত্যাদি। রমনা ঢাকা শহরের

সৌন্দর্য্যের এক বিশেষ দিক। বুদ্ধদেব বসু ছাড়াও অনেক কবি, লেখক রমনাকে তাদের কাব্যের ইন্‌সপিরেসন রূপে পেয়েছেন। এক মোহনীয় আকর্ষণী শক্তি এই রমনা মাঠের। ১৯৫৭ সনে যখন প্রফেসর সি, এল রেনের এর সাথে আমার অক্সফোর্ড-এ দেখা, প্রথম প্রশ্ন তিনি করলেন যে ১৯২২ সনে তার দেখা রমনার মাঠ এখন কেমন দেখতে, যেখানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক থাকাকালীন অনেক সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়েছেন। স্কুলে পড়ার সময় অনেক সন্ধ্যা আমিও কাটিয়েছে এই রমনা মাঠে আর ওর মধ্যে অবস্থিত দুটি মন্দিরের আরতির ঘন্টা শুনে (মন্দির দুটি ১৯৭১ সনে স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনারা নিশ্চিহ্ন করে দেয়)।

পুরোন ঢাকার আর একটি দ্রষ্টব্য ছিল, ঢাকা এয়ারপোর্ট। এ এয়ার-পোর্টটি কখন হয় আমি জানিনা, তবে ১৯৪২ সন পর্যন্ত এটি আমি দেখেছি। মিরপুর রোডের ওপর নিউমার্কেট থেকে মিরপুরের দিকে মাইল দু'একের মধ্যেই এটা ছিল। এয়ারপোর্ট না বলে এটাকে এয়ারস্ট্রিপ বলা ভাল। এখান থেকে ঢাকা-কলিকাতা ইমপেরিয়াল এয়ার ওয়েজ কোম্পানীর একটা সার্ভিস চালু ছিল। অনেকেই পুরোন ঢাকা থেকে ঐ এয়ারপোর্টে মাটিতে নামা, ছোট ফিক্‌সড লেন্ডিং গিয়ার এর প্লেন দেখতে যেতেন। ঢাকার নাগরিক জীবনে এটাও একটা বৈচিত্র ছিল। চিত্ত বিনোদনের জন্যও ১০ টাকা টিকেটে ঐ প্লেন ঢাকার আকাশেও দু-একবার ওড়া-যেত। ভিড় একেবারে কম হতোনা। মনে আছে আমার দাদীর বাধা দেওয়া সত্ত্বেও আমার দাদা ঐ প্লেনে ১৯৩৭ সনে একবার কলকাতা যান। দাদার মুখে তাঁর প্লেন চড়ার গল্প ঈর্ষা ও আনন্দের সাথে শুনতাম।

বলতে গেলে ঢাকা শহরের রাস্তায় তেমন বিজলী বাতি ছিল না কয়েকটা বড় রাস্তা ছাড়া। ছোট দোকানদারেরা কেরসিন তেলের কুপি জ্বালিয়ে দোকান করত, আর বড় দোকানগুলিতে কার্বাইড গ্যাসের আলো জ্বলত। দু একটা দোকানে অবশ্য বিজলী বাতি জ্বলত।

পাকা ইমারতের সংখ্যা তেমন কম ছিলনা, তবে বাড়ীগুলি ছোটও বেশীর ভাগই একতালা ছিল। রাস্তা ঘাট খুবই সংকীর্ণ ও বেশীর ভাগই ইট বাঁধানো ছিল। বংশাল রোড (যে রাস্তাটা সোজাসুজি নবাবপুর থেকে চকবাজারের দিকে পশ্চিমে চলে গেছে) তার দু'পাশে ঘোড়ার গাড়ীর "আড়-গাড়া" ছিল। আড়গাড়া অর্থ যেখানে ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ী রাখা হোত।

এই সব আড়গাড়ায় সহিস ও কোচওয়ানেরা থাকত। এই সব জায়গায় নানান রকমের আড্ডা জমত ও মুখরোচক গল্পের সৃষ্টি হোত। ঢাকার ঘোড়ার গাড়ী চালকদের হাস্য কৌতুকের ধারাল দিকটার জন্ম এই সব নানান আড়গাড়ায়। আড়গাড়া শব্দের উৎপত্তি বলা মুস্কিল তবে আড় করে রাখা বাঁশে ঘোড়ার মুখের দড়ি বাঁধা থাকত বলেও হয়তো এগুলোকে আড়-গাড়া বলা হোত।

বছরে একবার বাংলার গভর্ণর ঢাকায় আসতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে অনেক উৎসব হোত। গভর্ণর সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হিসেবে কনভোকেশন-এ উপস্থিত থাকতেন। যেটা বর্তমানে "বঙ্গভবন" সেটা ছিল গভর্ণরের ঢাকা সফরকালীন বাসভবন। ঢাকার নবাবের প্রমোদ উদ্যান "শাহবাগে" (যেখানে বর্তমানে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ, আর্টস কলেজ, নুতন যাদুঘর অবস্থিত) একটা বৃহৎ আকারের চা চক্র হোত। মনে আছে ১৯৩৯ সনে আমি বাবার সাথে সে চা চক্রে যেয়ে ঐ সব জাঁক-জমক দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। নরফোক ও ডরসেট regiment-এর একটা ব্যাণ্ড পার্টিও সেখানে চা চক্রে মোতায়েন থাকত। তাদের একটা ছোট কেন্টনমেন্টও কাছাকাছি ছিল। বর্তমানে যেখানে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল তার কাছেই ঐ কেন্টনমেন্টটা ছিল ও ওর মধ্যেই আর্মির জন্য একটা ছোট সিনেমা হাউজও ছিল।

এই সব ছিল সেই আমলের ঢাকা শহরের বিশেষ আকর্ষণ। সিনেমা হল তেমন বেশী ছিল না। তবে ইসলামপুর-এ "লায়ন" সিনেমা, সদর ঘাটে "রূপ মহল", আরমানীটোলায় "পিকচার হাউজ" ও ঢাকা কোর্ট বিল্ডিং এর সামনে "মুকুল থিয়েটার" প্রধান ছবি ঘর ছিল। পলটন ময়দানে যেখানে বর্তমানে ষ্টেডিয়াম, তার ঠিক দক্ষিণে একটা ছোট সিনেমা হল ছিল ব্রিটা-নিয়া, নামে। সেখানে শুধু ইংরেজী ছবি দেখান হোত। ইংরাজী অক্ষরে ব্রিটানিয়া নামের নিচে লেখা ছিল Home of English Pictures.

আগেই বলেছি, সেই আমলে (১৯৩২-৪২) ঢাকা শহরে এত বেশী সিনেমা হল ছিলনা, তবে সিনেমার প্রতি সবারই আকর্ষণ ছিল। তখন সিনেমাকে "টকি" বলা হোত। কারণ তখন বোবা ছবির যুগ শেষ হয়েছে মাত্র ও 'কথা বলার যুগে" ছবি এসেছে। মনে আছে আমার দাদুর সাথে "মুকুল" সিনে-মায় (বর্তমান কালের "আজাদ সিনেমা") "আলাম আরা" ছবি দেখতে যাই। বোধ হয় সেইটি ছিল প্রথম ভারতীয় "টকি"। ছবি দেখে তেমন কিছু

বুঝবার বয়স তখনও আমার হয়নি, তবে পর্দার ওপর ছবি কথা বলছে ও আমরা শুনতে পাচ্ছি,। এইটাতে বিস্ময় লেগে ছিল। পরবর্তীকালে (১৯৩৬ থেকে ৪২) অনেক ছবি দেখেছি, যা শিশু কিশোর মনের ওপর গভীর দাগ কেটেছে। অধুনাকালে হারিয়ে যাওয়া কিছু ছবির নাম উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গীক হবে না বিধায় বলছি। বাংলা ছবির মধ্যে 'দেবদাস', দিদি', 'মায়া', 'দেশের মাটি', 'মুক্তি', 'সাথী', 'গৃহদাহ', 'ডাক্তার', 'সাপুড়ে', 'শেষ উত্তর', 'কাশীনাথ', 'অধিকার', 'বিদ্যাপতি', 'উত্তরায়ন', 'বিষবৃক্ষ' ছবির কথা মনে আছে। হিন্দির মধ্যে 'অচ্ছুত কন্যা', 'বান্ধান', 'কাংগান', 'ঝুলন', 'আনে-আওয়ারা', 'মাদার ইণ্ডিয়া জিন্দিগী', 'বাঁচান', 'নয়া সংসার', 'খানদান', এই ছবিগুলো বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। ইংরাজি ছবি Ben hur, Sartoga Trunk, Treasure Island, Mutiny on the bounty, Aloma of the south sea, Gold Rush, Great Dictator, Life of Emile Zola, Flash Gordon & Trip to Mars, শিশু মনকে প্রগাড় ভাবে আলোড়িত করেছিল। সেই যুগের অভিনেতা, অভিনেত্রীদের মধ্যে বংলা ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া, দুর্গ দাস, লীলা দেশাই, সাইগাল, পাহাড়ী স্যান্যাল, পংকোজ মল্লিক, যমুনা, চন্দ্রাবতী, ইন্দু মুর্খাজ্জী, শ্যাম লাহা, ভানু বানাজ্জী, উমা দেবী, মেনকা, অমর মল্লিক, অহীন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, ধারাজ ভট্টাচার্য্য, কানন বালা, হিন্দিতে ও উর্দুতে পৃথ্বিরাজ, সোহরাব, মোদি মতিলাল, দেবীকারানী, অশোক কুমার, লিলা চিটনিষ, দিলীপ কুমার, রাজকাপুর, শাহ নেওয়াজ, ইংরেজী ছবিতে Lionel Barrymoor, Charlie Chaplain, Paul Muni, Eddi Cantor, Laural Hardy, Merlin Dietritch, Myrna loy, Rita Hayworth, Greta Garbo,Regan (Now U.S. President) Lilian Gish, Roman Navarro, Gregory Peck, Robert Taylor,-এর অভিনয় বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

সিনেমার টিকেট এই আমলের তুলনায় অবশ্য খুবই সস্তা ছিল, কারণ সেই আমলে সবার কাছে তেমন পয়সা ছিল না, তাই তেমন ভিড়ও সব সময় হোত না। থার্ড ক্লাশ সাড়ে চার আনা, ইন্টার ক্লাশ নয় আনা, সেকেণ্ড ক্লাশ বার আনা ও ফার্ষ্ট ক্লাশ এক টাকা চার আনা করে ছিল। এছাড়া ফার্ষ্ট ক্লাশে পাঁচ আসন বিশিষ্ট বক্স রিজার্ভ করা যেত ও তাতে ছয় টাকার মত লাগত। মনে পড়ে আব্বার সাথে আমরা ঈদে-বখরিতে কিংবা পয়লা জানুয়ারীতে বক্সে সিনেমা দেখতে যেতাম। সিনেমা টিকেট ব্লাক মার্কেট করা তখন কেউ শেখেনি।

ঢাকায় শীতের মৌসুমে Circus, Carnival ও Exhibition হোত এবং এতেও প্রচুর লোক সমাগম হোত, বোধ হয় ১৯৪০-৪২ এর দিকে মাদ্রাজের 'রূকমাবাই' সার্কাস---ঢাকায় এসেছিল যা আমার স্মৃতিপটে এখনও উজ্জ্বল। ঐ সার্কাসে জোকারকে নাক দিয়ে সিগারেট খেতে দেখে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলাম। যাদুকর পি, সি, সরকার এর ম্যাজিকও কয়েক বার ১৯৪২-৪৩ এর দিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আকাশের দিকে একটা দড়ি ছুড়ে দিয়ে পি, সি, সরকার সেই দড়ি ধরে শূন্যে উঠে যেতেন ও ঘন ঘন করতালির মধ্যে নামতেন। অদ্ভুত বিস্ময়ে উপভোগ করেছি আমরা। এই সার্কাস, মেলা ইত্যাদি হয় রমনা মাঠে নয় করোনেশান পার্কে (সদর ঘাট) নয় নিমতলী মাঠে (পুরান যাদুঘরের ঠিক মুখমুখী) অনুষ্ঠিত হোত। সেকেণ্ড কেপিটেল, ধানমণ্ডি, গুলশান এই সব এলাকা শহরের বাইরে গ্রাম অঞ্চল ছিল।

ঢাকায় মাঝে মাঝে "কাওয়ালী" গানের আসর হোত। কলকাতা থেকে 'পেয়ারু কাওয়াল' বোধ হয় ১৯৩৮ এর দিকে একবার গান গাইতে আসেন। চকবাজারের সামনে সেই অনুষ্ঠান হয়েছিল। ধ্রুপদী গানের আসরে একবার ভিস্মদেব চাটার্জিকে ঢাকায় দেখেছি। তার অনুষ্ঠান যতদূর মনে পড়ে, কার্জ্জন হলে হয়েছিল। ঢাকার বিখ্যাত গায়ক গীরিন চক্রবর্তীও ঐ আসরে উপস্থিত ছিলেন।

আসরে বাংলা কবিতা পাঠ তখন তেমন জমজমাট' হয়নি। তবে মাঝে মাঝে উর্দু কবিতার 'মুশায়েরা' হোত। ১৯৪২ এর দিকে হাকিম হাবিবুর রহমান আখুনজাদার (বংশীবাজার) বাড়ীতে এক মুশায়েরায় আমি গিয়েছিলাম/সেই মুশায়েরা সন্ধ্যায় শুরু হয়ে ভোর ৫টা পর্যন্ত চলেছিল। সেই আসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক ডঃ মাহমুদ হাসান ও উর্দুর অধ্যাপক কবি এন্দালীবশাদানি উপস্থিত ছিলেন। মুশায়েরার অনুষ্ঠান খুব জমকাল হোত সেই সময়ে অনেকটা মোগল আমলের দরবারের মত। "তবক" দেয়া পান সরবরাহ করা হোত ও ঘন ঘন গোলাপ জল ছিটান হতো। ঢাকা শহরে কিছু এলাকা ছিল যেখানে প্রমোদ বালারা থাকতেন। আমপট্টির কাছে "সাঁচিপানদার" ও ইসলামপুর "কুমারটুলি" এলাকায় এরা বসবাস করতেন। জিন্দাবাহারের গলিতে এরা কয়েক ঘর থাকতেন। এরা বেশীর ভাগই হিন্দু ছিলেন ও গান, বাজনা, নাচে বিশেষ পারদর্শীনি ছিলেন। মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ও ধনী মুসলমান এদের Client ছিলেন।

প্রমোদ বালারা মাঝে মধ্যে বাইরে এসেও কোন কোন অনুষ্ঠানে নাচ গান করতেন। গান বাজনা শুনতে ও যৌন তৃপ্তির জন্য লোক সেখানে যেতেন। সেখানে যাওয়া ও প্রচুর পয়সা খরচ করা অনেকটা আভিজ্যাতের পরিচায়ক ছিল সেই সময়ে। আজকাল যেমন খুন খারাবির ঘটনা প্রায়ই শোনা যায় সে আমলে এসব খুব কমই শোনা যেত। কারণ বেশ কিছু প্রমোদ বালারা প্রায়ই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু পরিবার থেকে আসতেন ও বেশ কৃষ্টি মনা ছিলেন। তেমনি যারা সেখানে নিয়মিত যেতেন তারাও সমাজে নিম্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন না। ১৯৩৮ সনে যখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময়ে বেশ কিছু প্রমোদ বালারা সেখানে নিয়মিত আর্ষ্টিট হয়ে যান ও গায়িকা হিসাবে প্রচুর নাম অর্জন করেন, এদের মধ্যে দেব বালা দেবী ও গোবিন্দ রাণী বাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দ রাণী ১৯৩০ সনে হিজ মাষ্টারস ভয়েস রেকর্ডে তাঁর প্রথম গান রেকর্ড করেন। (আমার শিউলী ফুলের মালা, ঝরে গেল অনাদরে আঁধার করি ডালা)-এর থেকেই বোঝা যায় যে সেই আমলের প্রমোদ বালারা তাদের ব্যবসাকে Serious ভাবেই নিতেন ও সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থানে থাকতেন সেটা শুধু মানুষের যৌন তৃষ্ণা মেঠাতেই নয়। ডলি, মলি, সুসান্ এই রকম Anglo Indian নাম তাদের ছিলনা। অনেক সময় তাদের মাঝ থেকে কেউ প্রেমে পড়ে ধর্মান্তরিত হয়ে বাঁধা গ্রাহকে বিয়ে করে সুখে ঘরকন্যাও করেছেন, এমন নজিরও সেই আমলের ঢাকাতে বেশ কয়েকটা ছিল। এই দিক দিয়ে লাক-নাউয়ের "তাওয়াফ'দের সাথে ঢাকার সেই আমলের প্রমোদ বালাদের কিছুটা মিল দেখা যায়। সেই সময়ে ঢাকা শহরে কুসুম বাইজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার বাড়ী ছিল টাংগাইল জেলার জামুরকি গ্রামে। "জামুরকি কুসুম' এই নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। ঢাকা কলকাতা এমনকি বাংলাদেশের বাইরেও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি কুসুম বাইজীর পরি-চয়ের পরিধির মধ্যে ছিলেন।

বর্তমানে যেখানে সচিবালয় সেখানে আম বাগান ছিল ও জায়গাটা বড় নির্জন ছিল। সন্ধ্যার পর লোক চলাচল একদম কমে যেত। "O" Point থেকে যে পথটা সচিবালয়ের সামনে দিয়ে কার্জন হল পর্যন্ত চলে গেছে, সেই রাস্তা ছিল লাল কাঁকরের ও এতটা প্রসস্ত ছিল না, তবে রাস্তার এক পাশে ও শেষ প্রান্তে বিজলী বাতির অফিসে উজ্জল আলো রাস্তার কৌলিন্য বজায় রাখত। অনেক সময়ে রাত করে ঐ রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরবার সময়ে ভয় ও বিস্ময়-

য়ের অপূর্ব শিহরণ লাগত মনে। বর্তমানে যা হাইকোর্ট মাজার নামে পরিচিত তাতে লোক সমাগম মোটেই ছিল না। বরং সচিবালয়ের সামনে শা-মালেক ইয়েমেনির মাজারে বেশ লোক জমায়েত হোত

তখনকার ঢাকায় এক ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া মোটর গাড়ী তেমন ছিলই না। দু-একজন সৌখিন লোক ছাড়া কিংবা সরকারী বড় চাকুরে ছাড়া মোটর গাড়ী তেমন কারোই ছিল না। ঢাকার নবাব বাড়ীতে গোটা কয়েক গাড়ী ছিল মাত্র এবং সার্ভিস বাস মোটেই ছিল না। কারণ ঢাকা শহরের সাথে অন্য সহরের যোগাযোগ ছিলই না এবং শহরের মধ্যে বড় বাস চলাচলের অসুবিধা ছিল। দু একটা স্কুল বাস ছাড়া তেমন কোন বাস দেখা যেত না। বাস কে সেই সময়ে "লরি" বলা হোত। মাত্র একটা ব্যতিক্রম ছিল। ঢাকার চকবাজার থেকে একটা সার্ভিস ছিল যা সাভার-ফুলবাড়িয়া যেত এবং এটা পরিচালনা করতেন মোমিন মোটর কোম্পানী। এই ১৮/২০ মাইলের ভাড়া ছিল এক টাকা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও এই সার্ভিস চালু ছিল। ১৯৪০-৪১ সনে যখন পেট্রোল এর অভাব দেখা দেয় তখন এক বিশেষ উপায়ে Charcoal burner সংযোগ করে এই মোমিন মোটর কোম্পানী-কে এই সার্ভিস চালু রাখতে আমি দেখেছি।

ঢাকা শহরে পারিবারিক অনুষ্ঠান ও বেশ জমকাল ও বৈচিত্রময় ছিল। পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছেলেদের "খাৎনা" ও মেয়েদের "কান ফোড়ন" ও "নাক ফোড়ন" ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে প্রচুর আমোদ আহ্লাদ করা হোত। সাজসজ্জা, গেট সাজান, বিলিতি ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা ও প্রচুর খাওয়া দাওয়া হোত। ডেকোরেটরদের দোকান তখন ছিলনা এবং সেই জন্য গেট নির্মাণের এক-ঘেয়েমি তেমন দেখা যেত না। লাউড স্পিকার বা মাইক ও তেমন ছিলনা, তাই কর্কশ গানের উৎপাত ও কম ছিল। সামর্থ্য ও সখ অনুযায়ী কলাগাছ কিংবা দেবদারু পাতা দিয়ে তোরণ নির্মাণ করা হোত। অনেকে আবার মাটির কলস ও ছন দিয়ে গেট সাজাতেন। আর একটি ব্যাপারকে ও কেন্দ্র করে বেশ উৎসব হোত। সেটা ছিল কন্যার প্রথম "ঋতু দর্শণ"। যদিও ব্যাপারটা মেয়ে মহলেরই তবুও প্রচুর সাজসজ্জা, গান বাজনা ও খাওয়া-দাওয়া হোত এটিকে কেন্দ্র করে। অনেক অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে 'মে রাসিনের' গান ও নাচ মাস খানেক ধরে চলত। "মেরাসিন" আজকাল তেমন দেখা যায় না। এরা ছিলেন সমাজে অনুন্নত মাঝবয়সী গায়িকা মেয়ের দল এবং সামান্য পয়সার বিনিময়ে কলা-কৌশল সহকারে নাচ

দেখাতেন। তাদের মধ্যে 'হারমোনিয়ামের' ব্যবহার তেমন ছিল না, তবে তারা ঢোল ব্যবহার করতেন। মুসলমানেরা বিশ্বাস করতেন "হিজরার নাচ" অনুষ্ঠিত হলে পাপ হয়, এই বিধায় হিজরার নাচের তেমন রেওয়াজ ছিল না। ডোম, চামার ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এইটি সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু "ছাদ পেটানর" গানের সময় দু'একটি "হিজরা" দেখা যেত।

বিয়ের ব্যাপারটা ছিল অবশ্য খুবই জাঁকজমকের, তবে তাতে অহেতুক পাশ্চ্যাত্যের ছাপ তখনও পড়েনি। গরীব পরিবার হলে বর তার লোকজন নিয়ে মসজিদে বসতেন ও পরে অনুষ্ঠান শেষে স্ত্রী আচারের জন্য মেয়ে মহলে যেতেন। "আচকান ও পাগড়ী" বরের প্রধান বেশ ভূষার অঙ্গ ছিল ও কনেকে অনেক সময়ে লাল বেনারসী শাড়ি কিংবা লাল সাটিনের "গাড়ারা" পায়জামা পরান হোত ও প্রচুর অঙ্গ সজ্জা করা হোত। গায়ে সোনদা ও হলুদ মেখে স্নান করান হোত ও "চুমকী" ও আফসন "দিয়ে মুখে আলপনা করা হোত। নেইল পলিশের সে সময়ে রেওয়াজ ছিলনা, তবে নানা রকমের কৌশলের সাথে কনেকে "মেহদী" পরান হোত। কুমারী মেয়ের পরিচিতি ছিল, নাকে "নথ" পরা এবং বিয়ের পর সেইটি খুলে ফেলা হোত ও "নাক-ফুল" পরিয়ে দেওয়া হোত। অবশ্য আজকাল এটার তেমন রেওয়াজ নেই। বাসর রাত্রির পর দিন ভোর বেলায় কোন এক বর্ষয়সী মুরুব্বি ধরনের মহিলা কনেকে একান্তে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে "নথ" খুলে ফেলতেন ও "নাকফুল" পরিয়ে দিতেন। মধ্যবিত্ত অনেক পরিবার বিয়েতে সাধ্যাতিরিক্ত পয়সা খরচ করার লোভ সামলাতে পারতেন না এবং অনেক সময়ে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়তেন, কারণ তারা মনে করতেন এতে তাঁদের মান বজায় থাকবে। অবশ্য এ ধারণাটা এখনও অটুট আছে। বিয়েতে খাওয়া দ.ওয়ার মধ্যে মোরগ,-পোলাও, কবাব, কোপ্তা, কালিয়া, রেজালা, জর্দ্দা, বোরহানি থাকত, তবে "বিরয়ানির" রেওয়াজ তখন তেমন ছিলনা। আর একট জিনিষ রান্না হোত তাকে "দাম পোক্ত" বলা হোত। এটা সবজী ও গোস্ত দিয়ে ও পোলায়ের চাল ও জাফরান ও বিবিধ মসলা দিয়ে তৈরী হোত। "মোতানজান" বলে এক রকম রোষ্ট তৈরী করা হোত, তাতে প্রচুর চিনি, জাফরান ও দুধ দেওয়া হোত। এটা ছিল এক রকমের মুরগীর রোষ্ট, তবে এটা মিষ্টি হিসেবে পরিবেশন করা হোত।

যৌতুক দেওয়া নেওয়া নিয়ে তেমন অপ্রীতিকর ঘটনা খুব কমই ঘটত। যৌতুক দেয়াটা ছিল মেয়ে পক্ষের "স্নেহের দান" এবং বর পক্ষ এতে কোন

বিধি আরোপ করত না। বর্তমানে অর্থাভাব ও হঠাৎ পরের পয়সা পাবার আশা মানুষকে কোন্ পর্যায়ে নামিয়েছে তা প্রত্যহ ভোর বেলায় "দৈনিক" খুললেই দেখতে পারি। একটা সামান্য "ট্রানজিস্টার" রেডিওর জন্য স্ত্রীকে খুন সেই আমলে কোন রকমেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না।

কাবিন অনেক সময়ে পার্শীতে লেখা হোত তবে বেশীর ভাগ সময়ে উর্দুতে লেখা চলত। বাংলায় লেখা কাবিন খুব কম দেখা যেত। অভিজাত শ্রেণীর পরিবারে কাবিন পার্শীতে কিংবা উর্দ্দুতে হোত। "দেন মহরের" টাকা একটা প্রতীকের ব্যাপার ছিল। শরিয়ত অনুযায়ী অনেক সময়ে "দেনমহর" ১০ টাকা হোত, তবে অধিকাংশ সময়ে দু'পক্ষের মান বজায় রাখতে দেনমহর ত্রিশ, চল্লিশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যেত।

বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রায়শই মজলিশে এক রকমের কবিতা পাঠ করা হোত। এটা বাংলা, উর্দ্দু, ইংরাজীতেও লিখা চলত। এগুলোকে "প্রীতি উপহার", ভক্তি উপহার" বলা হোত। বরের ছোট ভাই বোন, বা বড় ভাই, বা বড় বোনের ছেলে-মেয়ে, বা কনের বড় ভাই বা ছোট বোনের তরফ থেকে এ'টা লিখা হোত। বিবাহের মজলিশে এ'টা পড়া হোত। এ'টা অনেকটা ছড়ার মত হোত ও এতে কিছুটা হাসি-ঠাট্টারও ব্যাপার থাকত। পেপার নাপকিন এর মত পাতলা ও রংগীন বর্ডার দেয়া কাগজে এ'টা ছাপা হোত। কখন কখনও সাদা কাপড়ের রুমালেও এই কবিতা ছাপা হোত। কবিতা কেমন হোত তার একটা উদাহরণ দি ঃ---

"বাহবা কি মজা
 দিদি মনির বিয়ে—
পেট্টা এবার ভরবে মোদের
 পোলাও কোর্ম্মা খেয়ে।
গরম লুচি ঝুরি ঝুরি হচ্ছে ভাজা
 তাড়াতাড়ি---
ক্ষীর দই হাড়ি হাড়ি---
 আসছে লোক নিয়ে---
বর সেজে জামাই আসছে---
 মোটর হাঁকিয়ে
তার সঙ্গে ভাব করব
 মিষ্টি কথা কয়ে।

কিংবা জামাইকে বলা হচ্ছে
"বাহবা তুমি সামন্ত ভায়া
বেশত মজার লোক---
দিদির ওপর আজ কেন গো পড়ল
তোমার চোখ।
চুরি করা বিদ্যা তুমি ভাল জান বলে---
অনায়েসে মনটি দিদির চুরি করে নিলে।
কিংবা বড় বোন বোলতেন ঃ
"বাক্স ভরা টাকা দিও--গোলা ভরা ধান
তার সাথে থাকে যেন বাপের
বাড়ীর টান।

এই রেওয়াজটা আজ-কাল-কার দিনে তেমন দেখা যায় না। লাউড স্পিকা-রের কর্কশ আওয়াজের চাপে এই সমস্ত--হালকা হাসির কৌতুক প্রায় ম্রিয়মান।

বিয়ের অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ ছিল কনের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়েতে সম্মতি দানের ব্যাপার। ব্যাপারটা যথার্থই আনুষ্ঠানিক। তবে অনেক সময়েই কনেকে বিয়েতে 'হাঁ করাতে বেশ সময় লাগত। কনে যেন খুব তাড়াতাড়ি "সম্মতি" না দেয় তার জন্য দু'একজন বর্ষয়সী মহিলা কনের পাশে বসে থাকতেন। কারণ খুব তাড়াতাড়ি সম্মতি দেয়টা কনের জন্য অশালীনতার পরিচায়ক বলে মনে করা হোত। আজকালও এই আনুষ্ঠানিক সম্মতির ব্যাপারে কিছু সময় লাগে, তবে সেটা সে আমলের তুলনায় অনেক কম। প্রথাটা অনেক'টা বিলুপ্তির দিকে। এই প্রথার একটা সৌন্দর্য্যের দিকও ছিল, সেটা হোল কনের "বাপের বাড়ীর জন্য টান" বাপের বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার বেদনা এই সম্মতিদানের ব্যাপারটাকে আরোও মধুময় করে তুলত। যেখানে মেয়ের জন্ম ও লালন, সেই অতি পরিচিত আবহাওয়া ছেড়ে যাওয়ার বিষন্নতা তাকে আরোও সুন্দর ও মোহনীময় করে দিত।

আন্তর্জাতিক বিবাহে এই ব্যাপার'টা কোন পর্যায় এসেছে তার একটা উদাহরণ দি। কনে এমেরিকান ও ছেলে বাঙ্গালী। ধর্মান্তরিত করে ঢাকায় বিয়ে হচ্ছে। আমার ওপর ভার ছিল আনুষ্ঠানিক ভাবে কনেকে "হাঁ" করান। মহিলা পরিবেষ্টিত শেতাঙ্গীনি কনে বসে আছে। আমি ইংরাজিতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম--- Do you give consent to the marriage

between you and........কনে তৎক্ষণাৎ হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে বল্ল Oh yes, I do with all my heart, I love him.. হাসির রোল উঠল। সম্মতি'ত দু'টোই এবং উদ্দেশ্যও এক, কিন্তু কি বিরাট পার্থক্য। একটাতে আছে অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার বেদনা ও অন্যটাতে একটা পেশাদারি সৌজন্যমূলক সম্মতির বার্তা।

সেই আমলে ঢাকার "আহসান মঞ্জিল' (ঢাকার নবাবদের বসত বাড়ী) একটা দ্রষ্টব্য জিনিষ ছিল। বিরাট "গুম্বজ" সম্বলিত কলকাতার "Victoria Memorial" পেটার্নের অসংখ্য কামরা বিশিষ্ট দো'তালা বাড়ী। দু'ই তালা হলেও বর্তমান কালের পাঁচ তলা বাড়ীর সমান উঁচু। এই দালান'টার ভেতর দু'টো বড় হল ছিল যাতে প্রায় ৫০০ লোক বসতে পারে। দরবার বা অন্য কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ঐ হল দু'টো ব্যবহার করা হোত। দামী বড় বড় বিলিতী তৈল চিত্র ও অত্যন্ত মহার্ঘ কাচের রঙ্গিন ঝার দিয়ে সাজান ছিল এই হল দু'টো। দামী কাঠের ও পিতল মোড়ান লাল মখমলের চেয়ার ও শোফা ছিল প্রচুর। গোটা দুই সিংহাসনও ছোট বেলায় আমি দেখেছি। সিংহাসন দুটো বোধ হয় রূপার ছিল ও বেগুনি রঙের মখমলের ওপর জড়ির কাজ করা আসন ছিল। হাতলে সিংহের মাথা শোভা পেত ও সিংহের চোখে লাল মনি বসান ছিল। শুনেছি ১৯০৪ সনে স্যার সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে মুসলীম লীগের প্রথম অধিবেশন ঐ হলেই হয়েছিল। সেই সময়ে একটা জমকালো সম্বর্ধনা হয়েছিল। ডেলিগেটদের জন্যও এ সময়ে একটা চমৎকার সুভেনিয়ার এলবাম উপহার দেয়া হয়েছিল, যাতে State Jewelleries এর রঙ্গীন চিত্র ছিল। আমার মার নানা ডঃ নওয়াব আলীকে ১৯০৪ সনে ঐ রকম একটা এলবাম উপহার দেয়া হয়েছিল যা আমার মা'র কাছে আমি অনেক দিন রক্ষিত থাকতে দেখেছি।

আহসান মঞ্জিলের সামনের দিকটা ইসলামপুরের দিকে ও পেছনের দিকটা বুড়িগঙ্গা নদীর দিকে। পেছনের দিকে একটা বেশ বড় বাগান ছিল ও তার মধ্যে একটা মাঝারি গোছের চিড়িয়াখানা ছিল ও বাগানটার ঠিক মাঝখানে শোভা পেত একটা বিরাট ফোয়ারা। অসংখ্য পাম গাছ ও বুগন ভিলা ফুলের ঝোপ ছিল। সমস্ত এলাকাটা প্রাচীর বেষ্টিত ছিল ও বড় বড় লোহার ফটক ছিল কয়েক'টা। ইসলামপুরের দিকে প্রধান ফটকের ওপর নহবত খানা ছিল সেখানে রোজ ভোরে সানাই ও নহবত বাজত।

আহসান মঞ্জিলের প্রধান সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময়ে দেখা যেত একটা লম্বা দাঁত ওয়ালা বিরাট "ম্যামথের" মাথা ও কাঠের সিঁড়ির দু'পাশে মধ্য যুগীয় নাইটদের লোহার বর্ম্ম শোভা পেত। আহসান মঞ্জিলের অন্য এক অংশে "মেয়েদের মহল ছিল ও সেখানে খুব কড়াকড়ি পর্দার ব্যবস্থা ছিল। নবাব বাড়ীর খুব ঘনিষ্ট মহিলারা সেখানে থাকতেন। তাদের জন্য সামনে ওয়ালী "আয়া" ও "মেয়ে ধোপা" নিচের তালায় থাকতেন। কয়েকটা চোরা কুঠরিও আহসান মঞ্জিলের মধ্যে ছিল, এবং সেগুলো ছিল এক তালাতে অনেকটা Basement এ। ওখানে ভূত থাকে এই ভয়ে ছেলে বেলায় আমরা সেখানে যেতাম না।

বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর নঙ্গর করা থাকত নবাবদের একটা প্রমোদ বিহারের ষ্টিমার তার নাম ছিল "তুরাগ"। পরবর্তীকালে ওটা বাংলার লাট এণ্ডারসনের পত্নীর নামে "মেরী এণ্ডারসন" নামকরণ হয় ও বর্তমানে পর্য্যটনের একটা floating resturent হিসাবে "পাগলা ঘাটে অত্যন্ত দীন হীন ভাবে দিন যাপন করছে।

পাথর ও ইট খসে খসে পড়া ভিতে বটগাছ গজিয়ে ওঠা একটা আড়ম্বর হীন নির্জন প্রাসাদ আজ অতীতের একটা কংকাল, ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের শুধু সাক্ষী বহন করে যাচ্ছে। অনেক অনেক দিন পর এখন শুনতে পাচ্ছি "আহসান মঞ্জিলকে" একটা জাতীয় যাদুঘর রূপান্তরিত করার প্লান বর্তমান সরকার হাতে নিয়েছে।

কলেজ ও ইউনির্ভার্সিটি

১৯৩৯ সনের শেষের দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধে। ১৯৪০ সনে মেট্রিক পাশ করে ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে ভর্তি হতে যাই। আজ যেমন কলেজ বা ইউনির্ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া এক মহা সমস্যা, সেই সময়ে সমস্যা থাকলেও সেটা এতটা প্রকট ও অস্বাভাবিক হয়নি। কারণ এত বেশী কলেজ ও ছিলনা এবং বর্তমানের তুলনায় পাশের সংখ্যাও ছিল নগন্য। পুরাতন হাই কোর্ট বিল্ডিংটা ছিল ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ—এটা একটা রাজকীয় বিল্ডিং; এমন একটা বিল্ডিং তখন বাংলাদেশ কেন, সারা ভারত-বর্ষে বেশী ছিলনা। এটা আসলে নির্মিত হয়েছিল গভর্ণরের বাস ভবনের জন্য, যখন বাংলা আসাম-কে এক করে একটা আলাদা প্রদেশ করার কথা উঠেছিল সেই সুদূর ১৯০৫ সনে।

ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন Dr Momtazuddin Ahmed তিনি ছিলেন দর্শনের লোক তবে ১ম বর্ষের ক্লাশে অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি আমাদের ইংরাজী পড়াতেন। তার ইংরাজী উচ্চারণের একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল, যা নিয়ে আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে হাসতাম। তিনি জামা কাপড়ে বেশ ফিটফাট থাকতেন এবং ছাত্রদের খুব স্নেহ করতেন। সেই সময়ের ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে। মিঃ জালাল আহমেদ ছিলেন ইংরাজীর লেকচারার। তিনি যেমন পড়াতেন ভাল তেমনি ছাত্রদের সাথে বন্ধুর মত মিশতেন এবং অনেক সময়ে অনেক ঠাট্টা তামাশ উপভোগ করতেন। এমনি করেই জালাল সাহেব আমাকে তাঁর স্নেহ বন্ধনে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবদ্ধ করে গেছেন। ইংরাজী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, কবি পরিমল ঘোষ। মাঝারি সাইজের গড়ন, হাতে একটা বিরাট ব্যাগ নিয়ে ক্লাশ-এ আসতেন। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে পুষ্ট এই কবি বাংলা খুব কম বলতেন এবং ক্লাশের বাইরেও আমাদের সাথে ইংরাজী বলতেন শফিকুর রহমান সাহেবকে আমরা পেয়েছিলাম অর্থনীতি বিভাগের লেক চারার হিসাবে। তিনিও ছিলেন দেখতে একটু খাট এবং উঁচু চেয়ারে বসে পড়াবার সময় তাঁকে দেখে বেশ মজা লাগত। তিনি অর্থনীতি এবং পলিটি কেল সাইন্স পড়াতেন ও ক্লাশে গুরু-গম্ভির ভাব বজায় রাখতেন। আমাদে ভূগোলের লেকচারার ছিলেন রসিদুল হক। আদব কায়দা দুরস্ত খুব চো ভদ্রলোক ছিলেন তিনি। তবে অনেক সময়েই ক্লাশ নিতেন না। বা ছিল পাটনায় ও বিহারী টানে ইংরাজী বলতেন। ইতিহাস পড়াতেন পূর্ণে

বাবু। তিনি ছিলেন স্বচ্ছ, সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ক্লাশে এসেই তিনি নোট দেওয়া শুরু করতেন ও ঘন্টা পড়লে থামতেন। তাঁর নোট টুকলে আর বই পড়ার প্রয়োজন হোত না। অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন তিনি। এই শিক্ষকের জীবনাবসান হয় এক মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে। সিদ্দিক বাজার এলাকায় যুদ্ধের দাপটে যখন কলেজ শিফট করে সেই সময়ে ১৯৪৪ কি ৪৫ সনে এক আততায়ীর হাতে তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হন।

যারা আমার সহপাঠি ছিলেন ও যাদের সাথে অনেকটা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিসেছি তার মধ্যে আলী আশরফ (বর্তমানে কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপ-নারত) ফজলুল করিম সর্দার (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজীনতির অধ্যাপক) নাসির উদ্দিন (এক কালীন বিখ্যাত টেনিস Player ও বর্তমানে অবসর ভোগী সিভিল সার্ভেন্ট) নূরুল ইসলাম চৌধুরী (অবসর ভোগী, হাই কমিশনার) আমাদের মধ্যে আশরাফ-ই সাহিত্য মনা ও কবি ছিল। সব রকম সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাকে পাওয়া যেত, এমন কি এক সময়ে স্ত্রী চরিত্রে চমৎকার অভিনয় করেছিল। কলেজে প্রায়ই debate ও literary fuuction হোত এবং ওতে জালাল সাহেবের পরিচালনায় আমরা অংশগ্রহণ করেছি। বদরউদ্দিন আহমদ বর্তমানে ঢাকা ইউনির্ভাসিটির রেজিস্ট্রার ও আমার সহপাঠি ছিলেন।

যদিও সেই সময়ে আমরা কিছু না কিছু রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতাম আমরা কেউ লেখা পড়া বাদ দিয়ে রাজনীতিটাকে বড় করে দেখেনি। অবশ্য ইউনির্ভাসিটি জীবনেই দু এক জনার সাথে পরিচয় হয়েছে, যারা রাজ-নীতি ছাড়া অন্য কিছু বুঝত না। তাদের কথা পরে বলব। সেই সময় (১৯৪২-৪৩) পাকিস্তান মুভমেন্ট খুব দানা বেধে উঠেছে। কংগ্রেস লিডারেরা অখণ্ড ভারতের দাবী তুলেছে এবং অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ সরকার হাবুডুবু খাচ্ছে। এ সত্বেও লেখাপড়ার আবহাওয়ায় তেমন কোন অবনতি হয়নি। অবশ্য মাঝে মাঝে "হরতাল" ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে না হোত তা নয় তবে সঙ্গত কারণ ছাড়া তেমন কেন হরতাল হোত না। কথায় কথায় হরতালের রেওয়াজ তখন তেমন ছিলনা।

ঢাকা শহরে সেই সময়ে বেশ কিছু আমেরিকান সৈন্য ছিল। তাদের কয়েকজনের সাথে আমাদের খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তারা মাঝে মাঝে কলেজে আসত। তেঁজগাঁও-এ Armed Forces রেডিও স্টেশন বলে একটা রেডিও স্টেশন ছিল এবং তার এক প্রোগ্রাম সহকারীর সাথে আমাদের

কয়েকজনার বেশ পরিচয় ছিল। তার নাম Halsy Davis। অনেক বছর পর তার কবিতার খ্যাতি শুনে মুগ্ধ হই। ১৯৫৫ সনে তিনি আমাকে তার এক কবিতার বই উপহার পাঠিয়ে ছিলেন।

১৯৪২ সনের শেষের দিকে আমি ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে ইংরাজী বিভাগে ভর্তি হই। সহপাঠি রূপে যাদের পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে অলি আশরাফ, বোরহানুদ্দিন আহমদ (বর্তমানে অবসর ভোগী সিভিল সার্ভেন্ট) আহসানুল্লাহ (অবসর ভোগী সিভিল সার্ভেন্ট) সরওয়ার মোর্শেদ খান (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) ফরিদ আহমদ (১৯৭২ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত) সোবহান চৌধুরী, আফিয়া খাতুন (বর্তমানে আমেরিকায় কালিফোর্নিয়া শহরে অধ্যাপনা করেন), শাহ আজিজুর রহমান (বাংলাদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী।) ছিলেন।

শাহ আজিজুর রহমান ছিল সব চেয়ে রাজনীতিতে তৎপর। পাঠ্য বিষয় ছাড়া অনেক কথা তার মুখে শুনতাম। চমৎকার বাংলা, উর্দ্দু, ইংরাজী, বলতে পারত ও অনর্গল বক্তৃতা করতে পারত। ফরিদ ও শাহ আজিজের মধ্যে বন্ধুত্বের একটা নিবিড় বন্ধন ছিল, তবে মাঝে মাঝে রাজনীতিক বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটিও মন্দ হোত না। সেই সময়ে বোধ হয় সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে রাজনীতিক আন্দোলন হঠাৎ খুব জোরদার হয়ে উঠে এবং হিন্দু-মুসলমান হলগুলোতে বেশ চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায় এবং নাজির আহমদ নামে একটি ছাত্র ঢাকা ইউনির্ভাসিটির মধ্যে ছাত্রদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হন। নাজির আহমদ হত্যার কারণ বলা মুস্কিল, তবে এটা সত্য ইউনির্ভাসিটিতে ছাত্রদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে পূর্ণাঙ্গ করার এটা ছিল একটা প্রয়াস। এই ঘটনার পর ইউনির্ভাসিটি মাত্র তিন দিন বন্ধ ছিল এবং এর পরই লেখাপড়ার আবহাওয়া আবার ফিরে আসে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হই, তখন সবে মাত্র ডঃ মাহমুদ হাসা[ন] ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছেন এবং ইংরাজী বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছে[ন] ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ রায়, ডঃ এস, এন, রায় ছিলেন পণ্ডিত লোক, তবে ক্লা[স] তেমন নিতেন না। প্রায়শঃ ক্লাশে চুপচাপ বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, আজ পড়াব না মন ভাল নেই, "মিসেস রায় আজ কলকাতা চলে গেছেন"। এমনি করে ক্লাশ ডিসমিস করে নিজের কক্ষে চলে যেতে[ন]

আমরাও উৎফুল্ল চিত্তে "মধুর" দোকানে চা খেতে যেতাম। ডঃ রায় এর স্ত্রী সুজাতা রায় ছিলেন, ডঃ রায় এরই মাসতুত বোন এবং ঢাকা কামরুন্নেছা কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। গুজব ছিল ডঃ রায় ও মিসেস রায় এ গভীর প্রেম ছিল এবং তারা নাকি গুরুজনের অবাধ্য হয়ে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন—সেই যুগে একটা সাহসের কাজ বটে। ডঃ রায় ছাত্রদের খুব ভাল বাসতেন, ও যখন মন মেঝাজ খুব ভাল থাকত তখন খুব যত্ন করে পড়াতেন। তাঁর একটা মুদ্রা দোষ ছিল। প্রত্যেক কথার পর একবার you see বলতেন। অপর একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি অনেকটা Legend হয়ে গিয়ে ছিলেন, তাঁর নাম পি, কে, গুহ। সেই আমলের সেক্সপিয়ার এক্সপার্ট। মোটা বেঁটে মত গড়ন, আর পরতেন ধুতি চাদর ও দরাজ গলায় বক্তৃতা করতেন। কম বয়সী শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন অমলেন্দু বোস, মন্মথ ঘোষ, শ্রীষ দাস, চারুপমা বোস, ফজলুল রহমান। এদের মধ্যে অমলেন্দু বোসই বেশ উপভোগ্য করে পড়াতেন এবং নতুন কিছু বলার তার একটা অভ্যাস ছিল। তিনি Browning পড়াতেন। পরবর্তীকালে অমলেন্দু বোস অক্সফোর্ড থেকে ডি ফিল করে ঢাকা ছেড়ে চলে যান ও অনেক বছর বেনারাস, আলীগড় ও কলকাতা ইউনির্ভাসিটিতে অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেন।

ইংরাজী বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে ও তাঁদের স্নেহের সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। এরা হলেন অর্থনীতির অধ্যক্ষ ডঃ এইচ, এল, দে ও গণিতের অধ্যক্ষ ডঃ এন, এম, বসু। তাঁদের সাথে পরিচয় হবার কারণ তাঁদের ছেলেরা আমার সহপাঠি ছিলেন যদিও এক ডিপার্টমেন্টে নয়। এইচ, এল, দে-র ছেলে অজিত ও এন, এম, বসুর ছেলে দেবব্রত আমার সঙ্গেই মেট্রিক ও ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে অজিত ইতিহাসে ও দেবব্রত অংকে ভর্তি হয়।

অবশ্য অন্য কারণে একজন বিখ্যাত শিক্ষককে মনে পড়ে। তিনি ডঃ হরিদাস ভট্টাচার্য্য। তিনি দর্শন বিভাগের প্রধান ছিলেন ও ঘোরতর রকমের কুলীন হিন্দু ছিলেন। তিনি ছিলেন গীতা সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও হিন্দু মোসলেম ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্ব তেমন বেশী পছন্দ করতেন না। খুব চমৎকার debate করতে পারতেন ও খুব ভাল পড়াতেন। রমজান মাসে পরীক্ষার তারিখ পড়াতে একবার আমরা হিন্দু-মুসলমান ছাত্রেরা মিলে তাঁর কাছে

পরীক্ষা পিছাবার দাবী জানাই। একজন হিন্দু মেয়েও আমাদের সাথে ছিল। সে যেইমাত্র বল্‌ল,

"স্যার রমজান মাসে রোজা রেখে পরীক্ষা দেওয়া কত কষ্ট"। হরিদাস বাবু খ্যাঁক করে বলে উঠলেন,

"হিন্দু-মোসলেম প্রেম দেখে আর বাঁচিনে"। বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর এস, এন, বোস ও সেই সময়ে ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে ছিলেন। তাঁর কয়েকটা বক্তৃতা শুনেছি তবে তেমন সান্নিধ্যে আসিনি।

সেই সময়ে অধ্যাপক তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর সাথে ছাত্রদের খুব ভাল সম্পর্ক থাকত। অনেক গরীব ছাত্র বেশ কিছু অধ্যাপকদের বাসায় থাকতেন এবং অনেকটা তাঁদের পরিবারভুক্ত হয়ে পড়তেন। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এমন একটা মধুর ছিল যে আজকে দিনে তা অনেকটা আদর্শ বলেই মনে হবে। দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া কখনও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কলুষিত হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না।

ইউনির্ভাসিটির কথা মনে হলেই আবাসিক হলগুলোর কথা মনে পড়ে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক হল এই দুটোই ছিল প্রধানতঃ মুসলমান ছাত্রদের হল। ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল প্রধানতঃ হিন্দু ছাত্রদের জন্য তবে বেশ কিছু খৃস্টীয়ান ছাত্র ঢাকা হলে থাকতেন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন বলে কিছু ছিল না। তবে হলগুলোতে ছাত্র ইউনিয়ন ছিল আর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছাত্রদের মাঝ থেকে মনোনীত হতেন তিনি মনোনীত হয়ে পরিষদ গঠন করতেন এবং এই ভাবে হলের সাংস্কৃতিব কার্য্য কলাপ চালনা করতেন। নির্বাচন খুব জাঁকঝমকের সাথে হোত তবে এমন অবস্থা কখনও ঘটেনি যাকে কেন্দ্র করে খুনোখুনি হোত। বাই রের রাজনীতির চাপও হল নির্বাচনের ওপর তেমন ছিলনা। দু একজ বাইরের রাজনীতিবিদ মাঝে মধ্যে ইউনির্ভাসিটিতে বক্তৃতা দিতেন তা ইউনির্ভাসিটির মধ্যে maturer Political party-র তেমন কোন অঙ্গিভূ দল থাকত না। ইউনির্ভাসিটির রাজনীতি ইউনির্ভাসিটির মধ্যেই আব থাকত, তার কারণ সেই আমলে ইউনির্ভাসিটির একটা স্বাধীন স্বত্তা ছি এবং এই স্বত্তা খুব কম সময়েই কলুষিত হয়েছে।

সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ছিলেন ডঃ মাহমুদ হাসান। সুদর্শন মা রুচি, ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আম

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর পরই তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর হয়ে যান ও ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট হয়ে আসেন। মোয়াজ্জেম সাহেব ছিলেন খুব অমায়িক ও ভদ্র। তিনি ছিলেন আরবীর অধ্যাপক তবে লেবাসে পুরোপুরি সাহেবী কেতার অনুরাগী। আমি আগা গোড়াই সলিমুল্লাহ হলের attached ছিলাম। বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করতাম, তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে সারাদিন বা সারা রাত হলে কাটাতাম। হলের খাওয়া দাওয়া খুব উন্নতমানের না হলেও বর্তমানের চেয়ে অনেক ভাল ছিল এবং হলের ছাত্রদেরকে জনসাধারণও খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত। আজকাল যেমন মাঝে মধ্যেই কোন কোন হলের কক্ষ থেকে রাম দাও, স্টেনগান, গাঁজার কল্কে, ডেগার বের হয় সে সময়ে তেমনটি হোত না এবং অনেকটা বনেদি ও affluent ক্লাশের ছেলেরাই হলে থাকত। আমার মনে আছে জনসাধারণের মনে সলিমুল্লাহ হলের ছেলেদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তেমন ছাত্ররাও ছিল মার্জিত রুচি ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেই জন্য সলিমুল্লাহ হলকে Place of trend setters বলা যেতে পারত। বর্তমানে শিক্ষার পরিবেশ দুষিত হওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার একটা উদাহরণ দেই।

কয়েক দিন হয় রাত্রি প্রায় ৯টার দিকে আমি রিকশা করে নিউমার্কেট থেকে ওয়ারী আসছিলাম। রিকশাওয়ালাকে সলিমুল্লাহ হলের সংলগ্ন বড় রাস্তা দিয়ে সর্টকাট হয়ে যেতে বলাতে সে নারাজ হয়ে বল্লে "সাব ঐ দিক দিয়া জামুনা। ঐ বাড়ীগুলিতে ডাকাইতরা থাকে। এক হপ্তা আগেও আমার এক পাসিনজার-রে ডেগার দেখাইয়া ঘড়ি, মানিব্যাগ, ছিনাইয়া লইয়া গেছে। বাপ-মা পাঠায় হালাগো মানুষ বানাইতে, হালারা ডাকাইত অইয়া বাইর হয়"।

হায়রে সলিমুল্লাহ হল। কারা থাকত, আর আজ কারা থাকে। বেদনায় মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। রিকশাওয়ালার সত্যকে স্বীকার করে অন্য পথ দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। শিক্ষার অতিরিক্ত প্রসার ও wrong admission Policy বোধ হয় এর জন্য কিছুটা দায়ী। তবে তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব জায়গায়ই অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। অর্থনৈতিক চাপের মুখে সামাজিক বিচলনের ফল এটা।

এই একটা ঘটনা থেকে বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। অবনতির কথা আমি বলছি না; বলছি

নীতির কথা, শিক্ষা এমন একটা জিনিষ সেখানে আর যাই থাক জোর করে গণতন্ত্র আনা অর্থহীন। সবাইকে যে মেট্রিক থেকে শুরু করে এম, এ, পর্যন্ত বা উচ্চ শিক্ষা পেতেই হবে এটা একটা নিরর্থক প্লান, কারণ এটা বর্ত্তমানে লক্ষণীয় যে অনেকেই কোন চাকুরী যোগাড় করতে অপরাগ হয়ে ধাপের পর ধাপ পড়াশুনা চালিয়ে যায়। তার জন্য যদি মেট্রিক বা ইন্টার মেডিয়েট পাশের পর তার যোগ্যতা অনুযায়ী কোন চাকুরী মিলত, তবে সে শিক্ষাঙ্গনে এই ভিড় সৃষ্টি করত না। এবং শিক্ষার মান ও অনেক উন্নত থাকত। সেইটা যে করতে পারেনা বলে এবং তার সংসার চালানোর জন্য টাকার প্রয়োজন বলে, তাকে সমাজে অন্য একটা role নিয়ে বাঁচতে হয়। রিকশাওয়ালার উক্তিটা বেদনা দায়ক তবে পুরোপুরি সত্য নয়।

পাকিস্তান এল

১৯৪৬-র শেষের দিকে সারা দেশে পাকিস্তান মুভমেন্ট-এর জোর আন্দোলন দেখা দিল। ঐ বছরই মে/জুন এর দিকে আমাদের এম এ,-র ফল বেরুল। পাকিস্তান হলে কি হবে না হবে এই নিয়ে রাজনীতিক কোন্দল। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে অনেকটা আপোসের ভাব দেখা দিলেও বীর সাভার কর ও হিন্দু মহাসভা পাকিস্তান মেনে নিতে পারল না। নানান জায়গায় বিক্ষোভ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতে লাগল যাতে জনজীবন বিশৃঙ্খলও বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। ছোট বড় শহরে দাঙ্গা বেঁধেই চলল। ঢাকা শহরে ও কোলকাতায় রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চালু রাখা হোল। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার দেশ ভাগ করে দিয়ে একটা সুরাহা করলেন। তবে দেশ ভাগের মধ্যেও কিছুটা চিরস্থায়ী গোলমাল বাঁধিয়ে রাখার জন্য পাঞ্জাবকে ভাগ করে পূর্ব-পশ্চিম পাঞ্জাব করা হোল ও বৃটিশ বাংলাদেশকে ভাগ করে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান করা হোল। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট মধ্য রাত্রি থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হোল। মনে আছে ১২ই আগষ্ট খুব উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। হঠাৎ ঢাকা শহরে খবর এল যে অস্ত্রেসজ্জিত এক বিরাট হিন্দুর দল ঢাকা শহরের সব মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আসছে। মুসলমানেরাও প্রস্তুত হয়ে রইল। অবশেষে কিছুই ঘটলা না।

১৪ই আগষ্ট সন্ধ্যা বেলায় আমরা স্যার নাজিমুদ্দিন রোডের অল ইণ্ডিয়া রেডিও অফিসে যাই। সেখানে অনেক পরিচিত লোকের সাথে দেখা হোল। কবি গোলাম মোস্তফাকে সেখানে দেখি। রাত ৯টার খবরে বলা হোল "অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে বলছি" কিন্তু রাত ১২টার পর হয়ে গেল "পাকিস্তান ব্রড কাস্টিং করপোরেশন ঢাকা থেকে বলছি"। দিল্লী ষ্টেশনের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল ও করাচী ষ্টেশনের সাথে ঢাকা ষ্টেশন যুক্ত হয়ে গেল। নামটা নতুন ঠেকলে বেশ পুলক অনুভব করেছিলাম, এইটি ভেবে যে স্বাধীন পাকিস্তানের একটা নতুন রেডিও ষ্টেশন হোল। রেডিও-তে চলল তখন ক্ষমতা রদবদলের ধারা বিবরণী ও কথায় কথায় "পাকিস্তান জিন্দাবাদ"। কিছু দিনের মধ্যে অনেক দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়ে গেল ও সুর করে ওসব গান প্রচারিত হতে লাগল। মাস খানেকের মধ্যেও পাকিস্তান জাতীয় সংগীত রচিত হয়নি তবে বাংলায় "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" গানটি খুব জনপ্রিয় হয়ে গেল। মনে পড়ে বোধ হয় ১৯৪৭ সনের

নভেম্বরে একটা গান প্রচার করা হোল উর্দ্দুতে এবং সেটাও খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গানটি হোল "জামি ফিরদাউস পাকিস্তান কি হোগি-জামানে মে, চামান-মে-সুবহাদান কাঁলিয়া ওজু শাবনাম কে করলেঙ্গ" ইত্যাদি গানটি খুব সম্ভব আব্বাসুদ্দিন রেকর্ড করেছিলেন।

দেশ গড়ার কাজে সবাই খুব মশগুল। অভাব অভিযোগ ছাপিয়ে আনন্দটাই ছিল প্রধান। পাকিস্তান হবার বছর খানের মধ্যে বেশ কিছু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ঢাকা সফর করে গেলেন। এবং এর মধ্যে সরদার আবদুর রব নিসতারও ছিলেন। কবি গোলাম মোস্তফার কবিতা "পাকিস্তানে অভাব-কি" আবৃত্তি হতে লাগল অনেকের মুখে মুখে। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দিপনা নিয়ে সবাই দেশের কাজে মেতে উঠল। আনন্দ কি রকম সব ছাপিয়ে উঠল তার একটা উদাহরণ দিই। আমার জনৈক হিন্দু শিক্ষক রেডিও পোগ্রাম শেষে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠতে ইতস্ততঃ করছিলেন। গাড়ী-ওয়ালা হাসি মুখে বলল "আরে সাব" উইঠা পড়েন, আপনিগো কি আর আমরা এখন কিছু কমু--আপনারা-ত এখন আমাগোর পরজা (প্রজা)।

১৯৪৮ সনে জিন্নাহ সাহেব ঢাকা এলেন। বিরাট জমায়েত হোল রেসকোর্স ময়দানে। (বর্তমানের সরওয়ার্দি উদ্যান) সেখানে জোর গলায় জিন্নাহ বলে গেলেন যে অনেক কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করে আমরা একটা নতুন দেশ কায়েম করেছি, এখন রক্ষা ও পালন করা আপনাদের কাজ। সবার মধ্যে যদি একতা বিশ্বাস ও নিয়মানুবর্তিতা (Unitly, faith and discipline, থাকে তবেই আমরা এগিয়ে যেতে পারব। তিনি আরও বললেন যে পাকিস্তানের একটা নিজস্ব ভাষা থাকা দরকার; কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে লোকেরা উর্দ্দু, সিন্ধি, পসতু, পাঞ্জাবী বলে ও পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা বলে, এই সব বাদ দিয়ে যদি আমরা একটা ভাষা নি যেমন উর্দ্দু তবে একাত্মবোধ নিশ্চিত হবে ও দেশও তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। তার এই যুক্তি বাংলাদেশে বিশেষ কার্য্যকরি হলো না। কারণ তিনি যখন কার্জন হলে কনভোকেশন এর বক্তৃতায় বললেন "Urdu and Urdu only Should be the State language of Pakistan." জোর আওয়াজ উঠল না না উর্দ্দু এবং বাংলা। মনে পড়ে সেই কনভোকেশনে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

এই ব্যাপারে অনেকটা মর্মাহত হয়েই জিন্নাহ সাহেব অল্প দিনের সফর শেষে করাচী ফিরে যান।

১৯৪৮ সনের শেষের দিকে আমি ঢাকা ইন্টার মেডিয়েট কলেজে লেক-চারার হয়ে কাজে যোগ দিই। তখন ঢাকা কলেজ প্রাসাদপম পুরাতন হাইকোর্ট বিল্ডিং থেকে সিদ্দিক বাজারে কয়েকটা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেই সময়ে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন জহুরুল ইসলাম সাহেব। অত্যান্ত অমায়িক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। সহকর্মী হিসাবে যাদের পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে ছিলেন মইনুল আহসান, (ইংরাজী বিভাগের অধ্যক্ষ) সফিউল আজম, আবদুল হক, হেসামুদ্দিন আহমদ, উর্দুতে হাসিব ও আহ-সান, আহমদ আসক। মনে পড়ে বেশ কিছু দিন পর আবু রাশদ মতিনুদ্দিন ইংরাজী বিভাগে বদলী হয়ে আসেন। ক্লাশ করার জন্য কয়েকটা টিনের শেড ছিল। সামনেই ছিল পুরাতন ঢাকা রেওলয়ে ষ্টেশন। হট্টগোল দিন রাত লেগেই থাকত। তেমন কোন কমন রুমও ছিল না, তাই ছাত্রেরা অবসর বিনোদনের জন্য ঢাকা Station এর Waiting room বেছে নিত ও অনেক সময়ে refreshment room এ যেয়ে নিশিদ্ধ পানিয়ের সদব্যবহার করত।

১৯৫১ সনের মাঝামাঝি রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে ওঠে। সচেতন ছাত্রদের মধ্যে মনে পরে ইসতিআক আহমদ (বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ব্যারিষ্টার ও আবদুল আউয়ালের কথা (প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ পরে আদমজী মিলের সর্ব্বদক্ষ ও পরিশেষে রহস্যময় মৃত্যুর শিকার) আরও কয়েকটি ছাত্রের কথা মনে পড়ে যেমন ওবেদুল্লাহ খান (বর্তমানে Bangladash Ambass-ador to U.S) ইকবাল আনসারী খান (প্রতিষ্ঠিত এডভোকেট) আজিজুল জলিল বর্তমানে (Would Bank Executive) Mosleuddin (প্রতিষ্ঠিত গায়ক, বর্তমানে লণ্ডনে বসবাসকারি) সিদ্দিক বাজার পরিবেশে ঢাকা কলেজের দিন এক রকম কেটেছে। সিদ্দিক বাজার পুরান ঢাকার অনেকটা প্রাণ কেন্দ্র। অঞ্চলটি মতি সর্দারের সর্দারীর এলাকা ভুক্ত। সেই জন্য কলেজে কোন গান বাজনার অনুষ্ঠান করলে প্রথমে একবার মতি সর্দারের সাথে আলাপ করে নিতে হোত। নইলে অনুষ্ঠান পণ্ড হবার ভয় থাকত। কাছেই ছিল সনামধন্য জনাব তৈফুর সাহেবের বাড়ী, কৃষ্টিমনা পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর মেয়েরা লায়লা আর্জুমান বানু ও মালিকা পারভিন বানু) গান বাজনায় পারদর্শী। এই গান বাজনা বন্ধ করার জন্য মতি সর্দার কাছাকাছি এক জায়গায় মসজিদ তৈরী করার পরিকল্পনা নেয়। সহাস্যে আমাদের বলে "স্বপ্নে দেখছি এইখানে মসজিদ নাই। আমারে মসজিদ বানাইবার হুকুম

হইছে। আল্লাতালার সান কি আর কমু" কিছু দিনের মধ্যে কাছাকাছি একটা মসজিদের গোড়া পত্তন হোল। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগের কথা। পরে শুনেছি তৈফুর সাহেব ঐ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র বাড়ী করছেন।

সিদ্দিক বাজার এলাকায় আর এক উপদ্রব ছিল, বস্তি নন্দিনীদের অবাধ চলাফেরা। বেশ কিছু ছাত্রেরা এদের খপ্পরে পড়ে যেত ও পরে মতি সর্দারের সঙ্গে আলোচনা করে রেহাই পেত। এরকম ঘটনা দুএক বার হয়েছে বলে মনে হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সন একটা বিশেষ দিন। আগেই বলেছি ভাষা আন্দোলন বেশ জোর দানা বেঁধে উঠেছে দু চার দিন আগে বেশ উত্তেজনা পূর্ণ আবহাওয়ায় জায়গায় জায়গায় পথ সভা হয়েছে ও শহরে ১৪৪ ধারা ছিল। ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিল, বর্তমানে যেখানে শহিদ মিনার, সেখানে এলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সালাম ও বরকত। দেশময় আগুন স্থলে উঠল। নুরুল আমিনের মন্ত্রী সভা টলমল। সেই সময়ে সংসদ অধিবেশন চলছিল। কয়েকজন সদস্য সভা কক্ষ ছেড়ে বেড়িয়ে এলেন ও জনতার সাথে যোগ দেন। ঠিক মনে নেই তবে বোধহয় আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ প্রথমে সভা কক্ষ ছেড়ে বেড়িয়ে আসেন। বর্তমান জগন্নাথ হল তখন পূর্ব পাকিস্তান সংসদ ভবন।

ঢাকা কলেজের আমরা প্রায় সব শিক্ষকই কাজ ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে আসি ও ঢাকা ইউনির্ভাসিটির অনেক শিক্ষক চাকুরীতে ইস্তাফা দেন মনে পড়ছে সেই দিনটি বৃহস্পতিবার ছিল। আমি অধুনালুপ্ত পাকিস্তান টু ডে-র অফিসে বসে একটা নিবন্ধ লিখেছিলাম যা'তার পরের দিন প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির নাম ছিল Blood how red it was এবং ওটা ছদ্ম নামে (Nemesis) প্রকাশিত হয়েছিল।

আসলে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে এক বিরাট বিভেদের সৃষ্টি করে। সেই ছিদ্র তারে আর জোড়া লাগেনি। ক্রমশঃ একই দেশের দুই অংশ একে অন্য থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। দুই অংশের রাজনীতিবিদেরাও এই ব্যাপারে তেমন সফল কাম হতে পারেন নি। নানান রকমের National Integration করেও দুই অংশের মধ্যে আন্তরিকতার সুর আর আনা সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ সন্দেহ বাড়তেই লাগল।

১৯৫২ সনের বছর খানেক পর আমি বেশ কয়েক বছরের জন্য বিদেশে যাই। ১৯৫৮ সনের দিকে ফিরে প্রথমে রাজশাহী কলেজে ও পরে চিটাগাং কলেজে অধ্যাপনা করি। সেই সময়ে চিটাগাং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আবু রুশদ মতিনুদ্দিন। কলেজের উন্নতি ও হয়েছিল প্রচুর। পুরান বিল্ডিংটা ভেঙ্গে নতুন বিল্ডিংয়ের গোড়া পত্তন সেই সময়েই হয়।

সেটা ১৯৬৩ সাল যখন চাটগাঁ কলেজে যোগ দিই। নূতন নূতন ঘর বাড়ীতে চিটাগাং কলেজ তখন সমৃদ্ধ। ছাত্র-ছাত্রীর আনা-গোনায় অলস মধ্যাহ্নগুলি প্রাণবান রোজই লেগে আছে, কোন না কোন একটা উৎসব। এদিকে সবে মাত্র গড়ে ওঠা "অধ্যাপক নিকেতনে" (কলেজ সংলগ্ন অধ্যাপক-দের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাটগুলি) অধীর আগ্রহে চলছে ফ্লাট গোছানোর পালা। হঠাৎ শুনলাম ভারতের সঙ্গে লেগেছে আমাদের যুদ্ধ--বোমাও যেন পড়ল এদিকে ওদিকে। নানাবিধ সময়োপযোগী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সাড়া দিল দেশের ডাকে। ঘুমন্ত বনানীতে জাগল শিহরণ। কর্ণফুলিতে আসল জোয়ার। ভাসলাম আমরা সবাই এক স্রোতে/প্রতিজ্ঞা। আর অটল বিশ্বাস মাংস পেশীকে কঠিন করে তুলল। শেষ হোল সতের দিনের দুঃস্বপ্ন।

মনে আছে চাটগাঁও কলেজে ইংরাজী বিভাগ আয়োজিত সেক্সপিয়ারের চারশত-তম জন্ম বার্ষিকী। অভিনব প্রেরণা জুগিয়েছিল সবার মনে। সুদূর কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রফেসর এল, সি, নাইটিস জানালেন অভিনন্দন। অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অনুষ্ঠানকে করে তুললেন বৈচিত্রময়। ইংরাজী বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দ ছাড়া আরও অনেক এতে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আল আজাদ ও উর্দুর প্রধান অধ্যাপক মরহুম সাদ মুনিরুদ্দিনের কথা মনে পড়ছে।

সেই সময়ে চিটাগাং কলেজে ইংরাজী বিভাগ একটা বিভাগীয় রোটারী ক্লাবের উদ্ভাবন করেছিল। পালাক্রমে সবার বাস ভবনে এটার আসর বসত। গান, গল্প পড়া কবিতা পাঠ, চলত অবিরাম। প্রায় তিন বছর এটাকেজিইয়ে রাখা হয়েছিল সবার আগ্রহ ও প্রচেষ্টায়। মেহেদী বাগে আমার ছোট ফ্লাট ক্ষণিকের জন্য হয়ে উঠত উৎসব মুখর। মাঝে মধ্যে এতে অন্য বিভাগের অধ্যাপকেরা অংশ নিতেন। সাহিত্যিক অধ্যক্ষ আবু রুশদ মতিনুদ্দিনের

বাসায়ও মজলিশ বসত। আমার কিছু ছোট গল্প সেই আসরে পড়া হয়। ধারাবাহিক ভাবে অধ্যক্ষ মতিনুদ্দিন তাঁর "নোঙর" উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়তেন।

স্মৃতি জীবনকে সমৃদ্ধ করে আর দেয় দুঃখ ও আকুলতা। এই আনন্দের বেদনাটুকুই মানুষ ধরে রাখতে চায় এবং এই আকুলতায় মানুষকে করে প্রাণবাণ। সেই আমলের চিটাগাং কলেজের অধ্যাপকেরা বর্তমানে কে কোথায় জানিনা--ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের জোয়ার ভাটার টানে কোথায় মিলিয়ে গেছে তবু তারা আমার স্মৃতির ফলকে উজ্জ্বল। অনেকের সাথে তাদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তারা হলেন আবু মোহাম্মদ, মাহতাবউদ্দিন, জি, এম, চৌধুরী, নূরুল ইসলাম, রণজিৎ চক্রবর্তী, আবদুর রশিদ, নইমুল্লাহ খান, মতিন চৌধুরী, মিসেস জহিরুদ্দিন, আবদুস ছোবহান, জাহাঙ্গীর সাদাত, মোনেম বিল্লা, কল্যাণী ঘোষ।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল/মের দিকে আমি ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েটে অধ্যক্ষ হয়ে যোগ দেই। সেই বছরই ২৯শে জুলাই আমার বাবা এন্তেকাল করেন। বাবার চলে যাওয়ার পর ছেলে বেলাটা যেন ফুরিয়ে গেল। যার সামনে সব সময়েই শিশু ছিলাম তাঁর বিয়োগে জনবহুল জগতে ও কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগতে লাগল। আমার মা'র সাহচার্য্য এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছু দিন লাগল।

১৯৬৮ সনের অক্টোবর মাসে সরকারী কুষ্টিয়া কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্যভার গ্রহণ করি। দেশে তখন রাজনৈতিক গোলযোগ চলছেই। শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনসাধারণ দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মানসিক ব্যবধান এত দূর বেড়ে গেছে যে এখন আর এক দেশ বলে স্বীকার করতে সবাই নারাজ রাষ্ট্র ভাষার আন্দোলন এখন পুরাপুরি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত; অর্থনীতিক ব্যবধান নিয়ে মন কষাকষি আরোও জোরদার। অবশ্য এ ব্যাপারে রাজনীতিবিদদের ও বিশেষ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবদান ছিল। রাজনীতিক ভাষ্য-কারেরা হয়তঃ অনেক কিছু বলবেন তবে আমার মনে হয় hate Campaign দু'দিক থেকেই এমন একটা পর্য্যায় উঠল যে বিছিন্ন না হয়ে আর উপায় রইল না। অবশ্য এতে বিদেশী রাষ্ট্রেরও কিন্তু অবদান যে না ছিল তা'নয়।

স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের এই মনোভাবের ফলে একটা ঘোরতর দুর্যোগ দেখা দিল। দেশ-কে একত্রিত রাখার শেষ চেষ্টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল পূর্ব পাকিস্তানীদের ওপর। ১৯৭১ সনের প্রথমপর্য্যায় মনে হোল যে এটা বুঝি বাঙ্গালী বিছিন্ন-বাদী রাজনীতিবিদদের শায়েস্তা করার জন্য কিন্তু ২৬শে মার্চ যখন তারা সার্ব্বজনীন হত্যালীলা শুরু করে, তখন সত্যই বাঙ্গালী জেগে উঠল এবং বাঙ্গালীর আর এক দফা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হোল এই সংগ্রমের কথা নতুন করে বলার আর কিছু নেই। এই সম্পর্কে আমরা অনেকে তথ্য সম্বলিত বই পড়েছি এবং নিজেও চোখে দেখেছি। যা ঘটল তা অভাবনীয়। বাঙ্গালী হারাতে লাগল বুদ্ধিজীবি, চাকুরিজীবি, মজুর, শ্রমিক, চাষী, ছাত্র-ছাত্রী, ছেলে-মেয়ে, মা-বাপ, ভাই-বোন। নয় মাসের এই জীবন মরণ সংগ্রামের শেষে বাংলাদেশে শাপলা ফুল আবার ফুটল, কৃষ্ণ চূড়ায় আবার আবীর মাখান লাল জেগে উঠল, স্বাধীন বাংলাদেশের সবুজ পতাকা উড়তে লাগল। শেষ হোল আত্ম সম্মানের যুদ্ধ। তবে আমার সব সময়েই মনে হয়েছে যে এই ব্যাপারে কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক উৎসাহ ছিল।

বাংলাদেশের জন্ম ও বর্তমানের বাংলাদেশ

বাঙ্গালীর জীবনে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন আনন্দ ও বেদনা এ দু'টা জন্যই অক্ষয় হয়ে থাকবে। একদিকে স্বাধীনতার আনন্দ ও অন্যদিকে নিহত আপনজনের জন্য বেদনা ও বিলাপ। মনে আছে ভোর ৬টার দিকে বেড়িয়ে পড়ি পাকিস্তান বাহিনীর আত্ম-সমপর্ণের দৃশ্য দেখতে। সেই সময়ে ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্টের কথা বার বার মনে পড়ছিল। সেই দিন ছিল বৃটিশ শাসনের শেষ আর ১৬ই ডিসেম্বর ছিল একটা স্বপ্নের শেষ যে স্বপ্ন বৃটিশ ভারতের নীপিড়িত মুসলমানেরা ১৯৪০ সন থেকে দেখে আসছিল। স্বপ্ন সত্যের মত হলেও অনেক সময়ে সত্য হয় না। এই স্বপ্নও সত্যের মত হয়েও সত্য হলো না।

বেশ কিছু দিন আনন্দ ও উৎসবের মধ্যে কেটে গেল। নানান দেশ থেকে সাহায্যও কম এলনা। হেলিকপটার থেকে বিস্কিট পর্যন্ত এল দরদী দেশ-গুলো থেকে, তবে এগুলোর সদব্যবহার কতটা হয়েছে, তা সঠিক বলা যাবেনা। স্বাধীনতার যখন যুদ্ধ চলছে, তখন আমি কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, দেশ স্বাধীন হবার পর আমি ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যোগ দিই। এর মধ্যে একবার কুষ্টিয়া যাবার সময় (বোধ হয় '৭২ এর জানুয়ারী মাস) দেখি কামার খালী ফেরী আর নেই, সেখানে Pontoon bridge করে অনেক সাদা রংগের ট্রাক ত্রিপল ঢাকা অবস্থায় বর্ডারের দিকে দ্রুত পাড়ি দিচ্ছে।

আগেই বলেছি স্বাধীনতার উন্মাদনা সবাইকে পেয়ে বসেছে এবং যার যা বলার নয় তা বলে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম এমন একটা বড় বিশৃঙ্খলার পর এমন হয়েই থাকে। কিন্তু যখন এই অবস্থা মাসের পর মাস ও বছর গড়িয়ে গেল, তখন স্বাভাবিক ভাবে মনে হোল বোধ হয় সামগ্রিক ভাবে অংকে কোথাও ভুল ছিল। এই সময়েই আমি ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যোগ দিই। এইটি আমার নিজের কলেজ। ছাত্র, প্রথম চাকুরী ও প্রমোশনের দু'এক ধাপ আমি কাটিয়েছি এখানেই। এখন অধ্যক্ষ হয়ে ৭২ সনে এসে যেন চিনতেই পারি না আমার পুরান কলেজ-কে। শিক্ষক বেশ কিছু তখনও আমার পরিচিত, তবে লালন শাহ পেটানের চুল ওয়ালা, হাতে স্টেনগান ছাত্র মূর্তির সাথে তেমন পরিচিত হবার পূর্বে সুযোগ হয়নি। ছাত্রদের ভিড় ও নানান রকমের অহেতুক আবদারে কলেজের ভাবমূর্তি অনেকটা নষ্ট হয়েছে

দেখলাম। ক্লাশ করার দিকেও অনেকটা গাফিলতি লক্ষ্য করলাম--বিরাট একটা সামাজিক বিবর্তনের পরে যা হবার হয় ঠিক তাই। স্বাধীনতা উত্তর সংগ্রামী মনোভাব তখন ও ছাত্রদের মন থেকে যায়নি।

তারপর নেতাদের কথা। এদের ফরমায়েশে তখন প্রশাসনের অবস্থা সংকটাপন্ন। পরিস্থিতিও আকাঙ্খার মধ্যে সামনজস্য যে কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ বলতে পারে না। এই অবস্থাকে অনেকটা সামলে নিলেন শেখ মুজিবর রহমান, তবে পুরোপুরি পারলেন না। বিশেষ করে তাঁরই ছত্র-ছায়ায় পালিত বেশ কিছু লোক এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করল যা তিনি নিজেও চাইতেন না। এই ভাবেই দেশ চলতে লাগল। বিদেশে মুজিবের ভাব-মূর্তি অনেকটা পরিছন্ন হোল, কিন্তু যে জনগণ তাঁকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী বানাল ও দেবতার আসনে বসাল তাদেরই হাতে তাঁকে নৃশংয ভাবে নিহত হতে হোল পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে ১৪ই আগষ্ট ১৯৭৫ সনে। বাংলাদেশ একজন সত্যিকারের নেতা হারাল। এরপর চল্‌ল কোন্দল, জনে জনে ও দলে দলে। এমন অবস্থায় সব দেশেই সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতায় আসতে হয়, বাংলাদেশেও তাই হোল। বেশ কিছু দিন পরে মেজর জেনা-রেল জিয়াউর রহমান দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি রাজনীতি নিরপেক্ষ হলেও শেষে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। ভাল-মন্দের কথা আমি বলব না তবে নেতৃত্বহীন দেশে যেন একটা নেতৃত্ব এল এবং ফল কিছু'টা ভালও হোল। তবে শেষ রক্ষা হলো না। ১৯৮১ সনের মে মাসে তিনিও শেখ মুজিবের মত নৃশংষ ভাবে চট্টগ্রামে নিহত হন। শেখ মুজিব ও জিয়া হত্যার কারণ কি সঠিক বলা বড় মুস্কিল, তবে ঘটে গেল ঘটনা দু'টি মাত্র ৬ বছরের ব্যবধানে এবং তাঁরা দু'জনই স্বদেশ বাসীর হাতেই নিহত হন। কিছু দিন আবার নিরাশা ও মাতম। রাজনীতিক অঙ্গনেও এক হতাশা ও অস্থিরতা। কিছু দিন রাজনীতিক অস্থিরতার পর জেনারেল এরশাদ দেশের কার্য্যভার গ্রহণ করে দেশকে আবার শুরু থেকে সাজাতে বসলেন। এক রকম সাজান অবশ্য এর আগে আরোও দু'একবার হয়েছে এবং এবারও তাই শুরু হোল। ফল অনেকটা শুভ হোল, কিছুটা শান্তি, শৃখলা ফিরে এল। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজ-নীতিক কোন্দল দেশকে দারিদ্রের শেষ সীমায় নামিয়ে আনতে লাগল। মাত্র ৬ বছর আগে যে আমেরিকান ডলারের মূল্য মাত্র ১৬ টাকা ছিল, তা প্রায় ৩০ টাকা হয়ে গেল। দ্রব্য মূল্য ও এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে

৩---

হু হু করে বাড়তে লাগল। কোন রকমের দুর্যোগ দেখা দিলে রিলিফের কাজ হয় বটে প্রচুর তবে তার চেয়ে অনেক বেশী কোন্দল ও বক্তৃতা হয়।

একজন শিক্ষক হিসাবে দেখি Value র অতিরিক্ত fall হয়েছে। যে সব Values নিয়ে আমরা ছাত্রাবস্থায় সেই সোনালী দিনে যাত্রা শুরু করেছিলাম তার কিছু fall হতে পারে এবং তার অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে, তবে যখন কোন যৌন আবেদনমূলক পুস্তকের পরিবর্তে ছাত্রের কক্ষ থেকে রাম দাঁও, ষ্টেনগান ও গাঁজার কল্কে বের হয়--তখন আবার মনে হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের Strategy তে কোথাও কোন রকমের বড় ফাঁক ছিল, যা একমাত্র ভবিষ্যৎ বলতে পারবে। স্বাধীন হবার পর পরই মুজিব হত্যা ও জিয়া হত্যা দেশে রাজনীতিক সংকট, অর্থনীতিক অবনতি সব মিলে এমন একটা ছবি মনে ভেসে ওঠে বা অনেকের মতে খুব শুভ নয়। এ যেন একই জায়গায় বার বার যাওয়া ও একই Starting Point থেকে Plane crush এর পর প্রত্যেক বার যাত্রা শুরু করা শুধু পাইলট বদলে নিয়ে।

খাতার শেষ পাতা

স্কুলে বা কলেজে পড়ার সময়ে যখন ঢাকা শহরের রাস্তা দিয়ে চলাচল করতাম। তখন দু'একটা মোটর গাড়ীর দেখা পেতাম। ঘোড়ার গাড়ীই ছিল সব। শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষ বা ঐরকম ছিল। জনসমাগম একমাত্র বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য সময়ে তেমন হোত না। নবাবপুর রোড, ইসলামপুর রোড, আমপট্টিতে কদাচিত ভিড় হোত। কিন্তু এখন যখন গুলিস্তান এলাকা দিয়ে চলাচল করি তখন মনে হয় ঢাকা শহরের ৪৮ লক্ষ লোকই বোধ হয় এক জায়গায় জড় হয়েছে। গাড়ী নিয়ে বেরু-নো'ত এক দুঃসাধ্য, পায়ে হাঁটাও দুঃসাধ্য, গায়ে গায়ে ধাক্কা দিয়ে পথ চলতে হয়। জনসংখ্যা বিস্ফোরন কেমন হয়েছে, তা' ফুট পাতের দিকেই তাকালে বোঝা যায়। ১০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় এক কোটির কোন স্থায়ী বাসগৃহ নেই। তারা প্রায় সারাজীবনই ফুটপাতে থাকে। ফুটপাতে ঘুমায়, খেলাধুলা করে বড় হয়, জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটায় ঐ খানেই ও শেষ পর্যন্ত ঐখানেই বেওয়ারিশ লাশ হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

জনসংখ্যা রোধ করার সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টা স্বত্বেও জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কর্মসংস্থান প্রচেষ্টায় যারা বিদেশে যাচ্ছে, তাদের সংখ্যা বেশী হলেও লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নগণ্য। তার ওপর পশ্চিম পাকি-স্তানের কর্মরত ও বাসরত প্রায় সব বাঙ্গালী তাদের আত্মীয় পরিজন নিয়ে বাংলাদেশে উপস্থিত। এই সব মিলে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে স্থানাভাবে হাস্যকর ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। কোথায়ও ঠাঁই নাই। এক তালা বাড়ী পাঁচ ছয় তালা করা হয়েছে। Hall, Hostels এ-ছাত্র-ছাত্রীরা, Doubbling, Tripling Flooring করে যাচ্ছে, সিনেমা সব সময়ই House full টাংগিয়ে রেখেছে, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সব উধাও হয়েছে, হাস-পাতালে রোগীরা Bed এ-ত নয়ই। বারেন্দায়ও জায়গা পাচ্ছে না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অগণিত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অপেক্ষায় এমন কি কবরস্থানেও তেমন জায়গা নেই, অনেকে মৃত্যুর অনেক পূর্বেই এক কবরের জায়গায় কয়েকটা advance book করে রেখেছে, পাছে সেখানেও House full হয়ে যায়।

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেরই অবস্থা অনুরূপ, তবে এতটা হয়নি। কারণ, উল্লেখ করে লাভ নেই, কিন্তু যা ঘটে চলেছে তা-দেখেই আতংকিত হচ্ছি। সেই সোনালী দিনগুলি কোথায় গেল, যখন না চাইতেই অনেক কিছু পাওয়া যেত। সেই "সব পেয়েছির" বাংলাদেশ আজ যেন "নেইকো কিছুর দেশ",

যেখানে দারিদ্র ও অভাবে জেঁকে বসে আছে। এক মাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে এর শেষ কোথায়। উন্নত দেশগুলোও নানারকম সাহায্যত দিয়েই চলেছে, তবে এও ঠিক শুধু সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কোন দেশ দাঁড়াতে পারে না, আর তার ওপর যখন সাহায্যের পেছনে বিশেষ বিশেষ স্বার্থ বাঁধা থাকে।

আমার এই সামান্য স্মৃতিচারণে, অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ হয়নি। তবে চলার পথে অনেক খ্যাত, অখ্যাত লোকের দেখা মিলেছে, যাঁরা আমার স্মৃতির ফলকে উজ্জল। সবার কথা বলা সম্ভব নয় তবে কয়েকজন যাদের আমি নিকট থেকে দেখেছি, তাদের কথা বলে আমার স্মৃতিচরণ শেষ করব। আমার বাবা-মা'র কথা দিয়েই শুরু করি।

আব্বা (আবুল হোসাইন)

আব্বার সাহচার্য্য তেমন পেতাম না, কারণ সরকারী চাকুরদের যা হয় তাই। তিনি রেজিস্ট্রেশন বিভাগের অফিসার ছিলেন ও বাংলাদেশের নানান শহরে তাঁকে বদলী হতে হোত। সেই জন্য আমাদেরকে (মা এবং আমি) বেশীর ভাগ সময়ে ঢাকায় রাখতেন, যাতে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত না হয়। তাঁর ইংরাজী ও পার্শি সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল ও মিল-টনের Paradise lost অনেকখানি মুখস্ত বলতে পারতেন; তেমনি সাদির গুলিস্তা আবৃত্তি করতে পারতেন। কোন দিন তিনি নিজের মতামত জোর করে চাপিয়ে দেন নাই এবং আমাকে গান বাজনায় প্রায়ই উৎসাহ দিতেন। যখন আমি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়ে চাকুরী পেয়েও চাকুরীতে যোগ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে ঢাকা কলেজের লেকচারার হতে চাই, তখনও তিনি আমার মতামতের ওপর নিজের মতামত চাপান নাই যদিও তিনি জানতেন মাষ্টারির চাকুরী আমার অর্থনীতিক অস্বচ্ছলতা ডেকে আনবে। তদানিন্তন ডি, পি, আই, ডাঃ কুদরতে খোদাকে বলে ছিলেন "Azhar perhaps wants to remain a poor teacher & does not like a red Carpetted life. I Leave it to him Let him shine in his own line. I am rather happy about his choice".

নিজে রাঁধবার সখ ছিল ও ভাল খাবার খুব পছন্দ করতেন ও লোককে খাওয়াতে ভাল বাসতেন। অসুখ বিসুখের সময়েও ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও অনেক মুখরোচক জিনিষ খেতেন ও বলতেন 'মরতে'ত একদিন হবেই,

আল্লার সব নেয়ামত যদি না উপভোগ করি, বেইমানি হবে।" এই বলে হাসতেন। আমার পড়াশুনার দিকে খুব নজর রাখতেন, যেমন রাখতেন recreation-এর দিকে। ভাল সিনেমা আসলে সাথে করে দেখাতে নিয়ে যেতেন ও মাঝে মধ্যে নিজে ছু'টি নিয়ে দার্জিলিং শিলং মিহিজাম, শিমুলতলায় বেড়াতে নিয়ে যেতেন। যা পেতেন দু'হাতে খরচ করতেন ও প্রায়ই বলতেন "Future is a misnomer. If there anything called "future" it should take care of it self". Why should I bother about it "আল্লাহ কাউকে ভুখা রাখবে না। ধর্ম্মে আনুষ্ঠানিকতা তেমন পছন্দ করতেন না। নামাজ ও রোজার ততটা পায়বন্দ না হলেও মাঝে মাঝে রমজান মাসে রোজা রাখতেন ও নামাজ পড়তেন। কোথাও বেড়াতে গিয়ে কারো বাড়ীতে নামাজের সময় হয়ে গেলে গৃহস্বামীকে বিব্রত করে নামাজের তোড়জোড় করা তেমন পছন্দ করতেন না। বলতেন "কাজা নামাজ পড়াও ভাল, একজনকে জ্বালাতন করে কি লাভ।"

তবে আব্বার একটা দোষ ছিল তিনি প্রায় সব কথা সবাইকে বলতেন, কিছু লুকাতে জানতেন না। কোন কিছু গোপন করে রাখা, এমন কি পারি-বারিক ব্যাপারেও করতেন না। এতে অনেক সময়ে অসুবিধা হোত এমন কি পারিবারিক কলহ ও তবুও ঐ'টে ছিল তাঁর সহজাত স্বভাব। অবসর গ্রহণ করে ১৮ বৎসর পেনশন ভোগ করে ১৯৬৬-র ২৯শে জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন।

আম্মা (বেগম খায়রুন্নেছা)

আম্মার একমাত্র সন্তান হিসাবে তাঁর সমস্ত ভালবাসা ও যত্ন আমার ওপর বর্ষিত হোত। অনেক সময়ে এতটা বেশী হোত যে স্বাধীনতা বলে কোন কিছু আমার শৈশবে ছিল না। মাঝে মাঝে এই নিয়ে আব্বা আম্মার মধ্যে যে রাগারাগি না হোত তা নয়, তবুও আমার ব্যাপারে আম্মার দায়িত্বের ঐ'টে একটা বড় দিক ছিল। শৈশবে দু'টি চাকর আমার জন্যে থাকত। একটির কাজ ছিল আমার সাথে খেলা করা ও অন্যটির আমার জামা-কাপড় তদারক করা, যদিও জামা-কাপড় আম্মা নিজ হাতেই পরাতেন। পড়াশুনার ব্যাপারেও আম্মার সুনজর শৈশবে পেয়েছি কোরান ও পারসী তাঁর কাছেই প্রথম পড়েছি। রাত্রি জেগে এমনকি এম, এ অনার্স পরীক্ষার আগেও পড়াশুনা তিনি পছন্দ করতেন না। রাত ৯টায় খেয়ে ঘুমান-ঐ যে

অভ্যাস শৈশবে হয়ে গেছে, আজও তাই। বিদেশে যখন গিয়েছি চিঠিতে পড়াশুনার কথার চেয়ে "কি খাই", জিজ্ঞাসা করেছেন অনেক বেশী ।

আম্মার একটা বিশ্বাস মানুষ যদি ঠিক মনে আল্লার কাছে কিছু চায়, আল্লা তাকে তা দেবেনই। এবং এ'টিই তিনি শৈশব থেকে আমার মনেও বসাতে চেষ্টা করেছেন। যদিও নানান রকমের শিক্ষার প্রলেপে এই কথাটা আমার মনে অতটা শিকড় গজাতে পারেনি। তবুও আমার মনে হয় কথাটার মধ্যে একটা সত্য আছে যা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। আল্লার ওপর "তাওয়াক্কাল" এ'টা উনার সব কাজেই দেখেছি, এবং আরোও বেশী দেখেছি যখন কোন কিছু না জেনেই তিনি একটা কাজে হাত দিয়েছেন অথচ শেষ পর্যন্ত উৎরে গেছেন।

অত্যাধিক স্নেহশীলা বলে অনেকেই তাঁকে ঠকিয়েছে, বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনেরা তবুও তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার টান পড়েনি। বার্দ্ধক্যে অনেকেটা শয্যাশায়ী হয়েও তাদের খোঁজ খবর রাখতেন। আমার এই স্নেহশীলা জননী ১৮ই অক্টোবর ১৯৮৪ সনে সবাইকে কাঁদিয়ে জান্নাতবাসী হন।

মাষ্টার সাহেব

ইনার ভাল নাম আর্শাদ আলী খান। আমাদের বাসায় জায়গীর থাকতেন ও বাংলায় M. A. পড়তেন। আমি যখন মেট্রিক পড়ি, সেই সময় এসেছিলেন ও বছর চা'রেক আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমি অংকে বরাবরই কাঁচা, তাই তার কাছ থেকে অংক দেখিয়ে নিতাম। বাড়ীর অন্দর-বাহির সব জায়গায় তাঁর যাতায়াত ছিল ও মা-তাঁকে বেশ স্নেহ করতেন। আমরা এক সময়ে বাড়ীতে স্টেজ বেঁধে অভিনয় করি, শরৎ চন্দ্রের "দেব দাসে"র ভূমিকায় মাষ্টার সাহেবকে নামিয়ে ছিলাম। মন্দ অভিনয় করেননি, তবে আমাদের বাড়ীর চাকরানী 'পেয়ারুর'মা মাষ্টার সাহেবের মদ খাওয়ার অভিনয় পছন্দ করেনি। প্রায়ই আম্মাকে জিজ্ঞাস করত "আচ্ছা মিয়ার মাষ্টার সরাব খায় না কি, সরাব খাইতে দেখলাম যে--,। আর সরাব খাইলে আমি তার ভাত নিয়া নিচে যামু না"। বড় আনন্দময়ী ও স্নেহশীলা ছিল এই পেয়ারার'মা। তার কথা পরে বলব। মাষ্টার সাহেব Excise Superintendent হিসাবে অনেক দিন হয় retire করেছেন। এখনও মাঝে মধ্যে আসেন।

প্রবোধ মিত্র

তিনি আমার প্রাইভেট শিক্ষক ছিলেন। সে কালের ইংরাজীর এম, এ ও এক স্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন ও পরে কামরুন্নেছা কলেজে লেক-চারার হয়েছিলেন। খুব ভাল ইংরাজী জানতেন ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। মাথা জোরা টাক ও স্বাস্থ্যবান এই পুরুষ আমাকে অনেক দিন পড়িয়েছিলেন ও বড় স্নেহ করতেন। সেই রকম স্নেহের ছোঁয়াছ আমি অনেক দিন দেখিনা। স্কুলে পড়াকালীন আমি প্রায়ই জ্বরে ভুগতাম ও মাথার যন্ত্রনায় কষ্ট পেতাম। অনেক দিন তিনি পড়াতে এসে দেখতেন আমি জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছি। আদর করে হাত বুলাতেন ও মা'কে বলতেন "দিদি ও এবার জ্বর থেকে উঠলে দার্জ্জিলিং বেড়িয়ে আসুক। আগে স্বাস্থ্য করে পরে লেখা পড়া। দেখুন'ত আমার স্বাস্থ্য, দু'জন জোয়ান ও আমার সাথে পারবেনা। ১৯৪৭-এর পর কলকাতা চলে যান ঢাকার বাড়ী বিক্রী করে, তারপর থেকে আর তাঁর খবর জানিনা।

পেয়ারুর মা

এ আমাদের বাড়ীর চাকরানী, এক নাগাড়ে ১৪ বছর কাটিয়ে গেছে আমাদের সাথে। অনেকটা আত্মীয় স্বজনের মত হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন ক্লাশ VI-এ পড়ি তখন পেয়ারুর মা আসে। এমন এক স্নেহশীলা আপন জন তার মধ্যে যে লুকিয়েছিল, তা কে জানত? অনেক বুক্‌নী খেত, আব্বার ও আম্মার, আরোও অনেকের, তবে তার মুখে হাসি কখনও মিলায়'নি। এতটা আপন হয়েছিল যে আম্মার পক্ষ নিয়ে আব্বার সাথে ঝগড়াও করত। তবে তার একটা বিশেষ Tantrum বা মেজাজ ছিল। থাক্‌ত আমাদের বাসার কাছেই, নিজের বাড়ী ছিল সারা দিন কাজ করে রাত দশটা নাগাদ চলে যেত, আবার পরের দিন সাতটার মধ্যে চলে আসত। কোন কোন দিন সে আসত না। লোক পাঠিয়ে ডাকতে গেলে ঝংকার দিয়ে বিদায় করে দিয়ে বলত "যা গিয়া" আমি আর তোগো কাম করুম না, আমার খুশি"।

আমরা অসহায় হয়ে অন্য কোন ঠিকা ঝি ঠিক করে নিয়ে কাজ চালা তাম। এমনি করে তিন কি চার দিন গেলেই, একদিন ভোর বেলায় ঠিক এসে হাজির পেয়ারুর মা—নূতন চাকরানীর হাত থেকে এটা ওটা কেড়ে নিয়ে বলত 'যা গিয়া তুই', তুই আইলি কুনখান-তুন। এইটা আমার বাড়ী। বাসুন'টা পর্যন্ত মাঝাতে পারে না, আবার কাম কর্তে আসে।"

স্বাভাবিক ভাবে আবার কাজ শুরু করে পেয়ারুর মা। আমরাও খুশী। সেও খুশী। নূতন ঝি-কে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে হয়।

পেয়ারুর মা বিধবা ছিল, দু'টি ছেলে নিয়ে থাকত, বড়টির একটা বেকারি ছিল ও ছোটোটি ছিল প্রায় আমার সমান। আমাদের নিত্যকার দুধওয়ালাকে "আপনি" বলে সম্বোধন করত ও আমার প্রাইভেট শিক্ষক প্রবোধ মিত্রকে "তুমি বলত"। আমি কোন স্কুল পরীক্ষায় ভাল ফল করি বা না করি, পেয়ারুর মা খালি হাতে সেদিন আসত না বলত "মিয়া ফাস্ট হইয়া পাশ করছে' আমি খালি হাতে কেমনে আমু মিঠাই লইয়া আইছি। আম্মার নিষেধ শুনত না, গোটা বেতনের অর্দ্ধেকটাই খরচ করে মিষ্টি নিয়ে আসত।

কোথায় গেল সেই স্নেহাশীলা ঝি আমাদের পেয়ারুর মা। অনেক দিন পর ১৯৫৭ সনে বিদেশ থেকে পড়াশুনা করে বাড়ী ফিরেছি। শুনে সে দেখতে এসেছে আমাকে। অনেক দিন পরও তার হাতে সেই চিরাচরিত মিষ্টির প্যাকেট, বলে "আমাগোর মিয়া অনেক কিছু পাশ কইরা বিলাত থেইকা আইছে। তার হাতে মিঠাই দিতে আইছি"।

অনেকক্ষণ কাটিয়ে গেল সেদিন সে আমাদের সাথে। বেশ বয়স হয়ে গিয়েছিল। কিছুটা মাথার দোষও হয়েছিল। তার ছোট ছেলে পেয়ারু তখন বেঁচে নেই। ১৯৫৫ এর দিকে সাম্প্রদায়িক দাংগায় সে মারা যায়।

অনেক কেঁদে কেটে পেয়ারুর মা সে দিন বিদায় নিল। আর এলনা। বছর খানেকের মধ্যে সদালাপি, স্নেহময়ী, মমতাবতী পেয়ারুর মা চলে গেল। সাধারণ সে তবে অসাধারণত্বের ছাপ রেখে গেল সে আমাদের সবার কাছে, সবাইকে কাঁদিয়ে, নিজে কেঁদে চলে গেল বিধাতার কাছে।

আবদুল গফুর

১৯৩৫ সনের কথা। গফুর ভাই আমার দুই কি তিন ক্লাশ ওপরে পড়ত। খুব ডানপিটে ছেলে School Sports-এ সব সময়েই Champion। তবে পড়াশুনায় তেমন কিছু না। নবম শ্রেণীতে দু বার ফেল করে কোন চাকুরী নিয়ে চলে যায়। পরীক্ষায় নকল করার নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করত। আমি কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় হলে বলত "আরে প্রথম হইতে পারলি না। ক-'ত যে প্রথম হইয়াছে তারে পরীক্ষার আগের দিন আটকাইয়া রাখুম তুই প্রথম হইয়া যাবি। সেই সময়ে আমার বড় মামা ঐ স্কুলের

শিক্ষক ছিলেন। সর্দ্দির ধাত ছিল তার তাই মাঝে মাঝে তাঁর চোখ লাল হয়ে থাকত। গফুর ভাই আমাকে বলত "আচ্ছা" তোর মামু নেশা ভাং করেনি। চোখ লাল কেন, বাঁচি মরি আমি হালা একদিন জিগামু"। অনেক বছর পর বোধ হয় ১৯৪৮র দিকে ঢাকা কোর্টের সামনে দেখা। গফুর ভাই তখন ঢাকা কোর্টে কোনও বিভাগে কেরানীর কাজ করে। আমাকে দেখেই বলল "তুই প্রফেসর হইচস শুনছি।" বেশ আমাগো স্কুলের নাম রাখলি---তোরে আরোও বড় হইতে হইব"। তার কথা জিজ্ঞাস করায় বলল "আর করুম কি। ভাল খাইতে পাইনা। Exercise বাদ দিছি।" আচ্ছা যাই---তারপর থেকে দেখা নেই। কোথায় গফুর ভাই, জানিনা।

জালাল আহমদ

ঢাকা ইন্টার মেডিয়েট কলেজে যখন ভর্তি হলাম, তখন ইংরাজীর লেকচারার হিসেবে আমি তাকে পাই। সেই সময়ে পরিমল ঘোষ ছিলেন, ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক ও জালাল সাহেব ছিলেন সিনিয়র লেকচারার। অত্যন্ত অমায়িক ও সদালাপি ছিলেন তিনি ও ছাত্রদের সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। শুধু বন্ধুর মত নয়, অনেক সময়ে অশ্লীল ঠাট্টা তামাসাও করতেন আমাদের সাথে। তিনি ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের Charge-এ ও সেই সূত্রে ছাত্রদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন। পড়াতেন ভাল ও নানা রকমের গল্প, কাহিনী বলে ক্লাশ জমিয়ে রাখতেন। অনেক সময়ে মাঝে মাঝে মধ্যে তাঁর দু'টি মেয়েকে নিয়েও কলেজে আসতেন। তাদের বয়স তখন ৮।৯ বছরের বেশী হবে না। হঠাৎ দেখি একদিন তাঁর একটি মেয়ের মাথা ন্যাড়া করে নিয়ে এসেছেন। কি খেয়াল হোল, জিজ্ঞাসা করলাম "স্যার ওর মাথা ন্যাড়া করেছেন যে"? কপট গাম্ভীর্যের সাথে বললেন "হ্যাঁ করব না ত কি? মাইয়া বেশ বড় হইয়া যাইতেছে, আবার চুল বড় রাখলে তোমরা কখন প্রেম ট্রেমে পইরা যাইবা ঠিক আছে? কোন রকমে পালিয়ে বাঁচলাম।

এই সেই জালাল সাব। যাকে আমরা সত্যিই একই রকম দেখেছি। সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আমি তার সাথে অনেক মিটিং এ বসেছি। (তখন তিনি ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ) দেখতাম তিনি একেবারেই বদলাননি। তাস খেলা ও চা ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। ধানমণ্ডির বাড়ীতে শেষ জীবনেও তাঁকে একা একা তাস খেলতে দেখেছি। জানালা দিয়ে দেখলেই ডাকতেন

"আরে আস তাস খেলাত শিখলানা চা খাইয়া যাও"। সদা হাস্যময় আমার এই শিক্ষক আজ ৪।৫ বছর পরলোক।

অজিত কুমার দে

অজিত আমার সাথে একই বছরে ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট কলেজে ভর্তি হয়। তার বাবা ডঃ এইচ, এল, দে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক। অজিতের গান বাজনার দিকে ঝোঁক ছিল এবং এই জন্য আমার সাথে তাঁর বন্ধুত্ব খুব সহজ ভাবে হয়েছিল। অনেক সন্ধ্যা আমি তাদের বাসায় কাটিয়েছি। দু'জনে এক সাথে বিকালে নির্জন রমনা লেকের ধারে বেড়াতাম। আই, এ পাশ করে আমি ও অজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই--আমি ইংরেজীতে, অজিত ইতিহাসে। প্রথমে আমি ও অজিত পরামর্শ করি যে দু'জনই অর্থনীতি পড়ব, কিন্তু এক গোল বাঁধল, এবং গোল বাঁধালেন অজিতের বাবা নিজে, তিনি কিছুতেই অজিতকে অর্থনীতি (সম্মান) নিতে দিলেন না। ঘটনাটা এমন গড়াল যে কয়েক দিন আমি ও অজিত খুব ক্ষুব্ধ হয়ে রইলাম। অজিতের বাবার স্পষ্ট মত হোল যে যদি অজিত অর্থনীতিতে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে যায় এবং হয়ত পেতে পারে, তবে তাতে তাঁর নিজের বদনাম হবে এবং সেই জন্য অজিতকে তাঁর নিজের বিভাগে নেওয়া ঠিক হবে না। অজিত ইতিহাস নেয় ও পরে পরীক্ষায় ফাষ্ট ক্লাশ পায়। আমি ও অর্থনীতি না পড়ে ইংরাজীতে ভর্তি হয়ে গেলাম। এই ঘটনাটা শুধু এই জন্যেই উল্লেখ করলাম যে আজকের দিনে কথাটা অদ্ভুত শোনালেও অনেকটা আদর্শের মত শোনাবে দু'জনে দুই বিভাগে ভর্তি হলেও, রোজ কার মত আমাদের সভা বসত কখন তাদের বাড়ীতে কখনও লেকের ধারে---কখন বা "মধুর" চার দোকানে। ১৯৪৭ সনের পর, অজিত ভারতে চলে যায় ও বরমা শেলে যোগ দেয়। পরে বর্মা শেলের মহা পরিচালক হয়ে অবসর গ্রহণ করে, বর্তমানে মাদ্রাজে এক Consultancy Firm-এ রয়েছে।

ডঃ মমতাজুদ্দিন আহমদ

১৯৪০ এর শেষের দিকে যখন আমি ঢাকা ইন্টার মেডিয়েট কলেজে ভর্তি হই সেই সময়ে ডঃ মমতাজুদ্দিন সেই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বেঁটে, কালো শক্ত গড়ন, মমতাজ সাহেব সাহেবী পোষাকে সুসজ্জিত থাকতেন ও ইংরেজীতে কথা বলতে ভাল বাসতেন। তিনি ছিলেন দর্শনের লোক তবে

প্রথম বর্ষ ক্লাশে আমাদের ইংরাজী পড়াতেন। তাঁর ইংরাজী উচ্চারণ তাঁর নিজস্ব মতে করলেও পড়াতেন ভাল ও ছেলেদের খুব ভাল বাসতেন। পরবর্তীকালে তাঁর সাথে আমার আরোও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় ও তার প্রায় সব সন্তানই কোন না কোন সময়ে আমার ছাত্র ছিল--১৯৪১ সনে বোধ হয় জুন মাসে বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথের তিরোধানে তাঁর লম্বা বক্তৃতা আমার অনেক দিন মনে থাকবে। কি বলেছিলেন বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তবে যে ভাবে ইংরাজী বলে ছিলেন তা আমাদের যথেষ্ট কৌতুকের খোরাক যুগিয়েছিল। গান, বাজনার দিকে বেশ ঝোঁক ছিল তার এবং তার সময়ই আমরা বিখ্যাত গায়ক কুন্দন লাল সায়গলকে নিমন্ত্রন করি গান গাইতে। বেশ অনেক দিন হয় ডঃ মমতাজ পরলোকে এবং বিশিষ্ট বাঙ্গালী শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি বহুল পরিচিত।

আব্বাস উদ্দিন আহমদ

পল্লী সঙ্গীতের অপরাজেয় শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের সাথে আমার পরিচয় ১৯৫২।৫৩ এর দিকে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই তিনি ঢাকায় আসেন ও পাতলা খাঁ লেনে এক বাড়ীতে থাকতেন। পরে পুরানা পল্টনের ঐ বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে আসেন। পুরানা পল্টনের ঐ বাড়ী ছিল আমার শিক্ষক ডঃ সুকুমার গাংগুলীর---তিনি কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে চলে যান পাকিস্তান হবার পর। ডঃ গাংগোলীর ঢাকার বাড়ীর সাথে আব্বাস উদ্দিন সাহেব তার কুচবিহারের বাড়ী বদল করেন। আব্বাস উদ্দিন সব সময়ই দুঃখ করতেন যে অত সুন্দর তাঁর বাড়ীর বদলে কি বাজে একটা বাড়ী তার ভাগ্যে জুটল।

তিনি ঢাকায় Song Publicity Officer হিসেবে যোগ দেন। প্রায়ই তিনি বলতেন "ঢাকার লোক গান ভাল বাসে না"। অত্যন্ত পরহেজগার ও নামাজী ছিলেন তিনি। অনেক অনুষ্ঠানের মধ্যেও তাঁকে নামাজ কাজা করতে দেখেনি। তার মেয়ে গির্নাকে (ফিরদোসী রহমানকে) খুব যত্নের সাথে গান শিখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীতে আমি প্রায়ই ওস্তাদ গুল মহম্মদ খানকে গান শেখাতে দেখেছি। বড় ছেলে মোস্তফা কামাল (বর্তমানে হাইকোর্টে বিচারপতি) গানের দিকে তেমন ঝোঁক নি তবে তাঁর ছোট ছেলে মোস্তফা জামান আব্বাসী বর্তমানে একজন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী) তাঁর বাড়ীতে এক পরিচ্ছিন্ন আবহাওয়া থাকত, যার জন্য

প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে যেতাম। অবসর গ্রহণের কিছু পূর্বে তিনি অসুস্থ হোন ও পরে ঢাকায় এন্তেকাল করেন। অসুস্থ অবস্থায় তাকে প্রায়ই দেখতে গিয়েছি। একদিন বলেছিলেন,

"প্রফেসর সাহেব। ঐ যে বাগানে ফুলগুলো ওরা ফোটে আর ঝরে। ওদের কে কেউ মনে রাখে। আব্বাসউদ্দিন ও তেমনি ফুটেছিলাম, আজ ঝরে যাচ্ছি। কেউ মনে রাখবে কি না এই নিয়ে ভাবি না"। গরীব দেশে এক বিরাট ও উদার মন নিয়ে জন্মে ছিলেন তিনি। জনগনের মধ্যে আজও তিনি অমর।

অবুরুশদ মতিনুদ্দিন

১৯৫২/৫৩ এর দিকে জনাব অবুরুশদ মতিনুদ্দিনের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। আমি তখন ঢাকা কলেজের ইংরাজীর লেকচারার ও উনি সেই বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক। অনেক দিন এক সাথে কাটিয়েছি আমরা। রাজশাহী কলেজ, চিটাগাং কলেজে এক সাথে চাকুরী করেছি। বিশিষ্ট ছোট গল্পকার ও উপন্যাসিক অবুরুশদ সুক্ষ্মভাবে কথা বলতে ভালবাসেন ও তার আলাপচারীতে হাস্যরসের ইঙ্গিত থাকে। উনি যখন চিটাগাং কলেজের অধ্যক্ষ, আমি খুব জাঁক জমকের সাথে সেক্সপিয়ারের চারশত তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করেছিলাম ১৯৬৪ সনে। নিজে গান না গাইলেও গান খুব ভাল বাসেন ও ভাল খাবারের দিকে বেশ ঝোক। শেষের দিকে ডি, পি, আই হোন ও পরে Education Councellor হিসাবে বিদেশে কাজ করেন, শেষ পর্যায়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরা আবার একত্রে কাজ করেছি ও তাঁর সান্নিধ্য উপভোগ করেছি। গোড়া থেকে এখন পর্য্যন্ত আমাকে তিনি তার ছোট ভাই এর মত দেখেছেন এবং অনেক সময়ে তার অনেক স্নেহাভিষিক্ত উপদেশ পেয়েছি।

আমার সব সময়ে মনে হয়েছে সাহিত্য ও সমালোচক হিসাবে তাঁর যেটুকুন প্রাপ্য তা বোধ হয় তিনি তা পাননি এবং এটার কারণ তার চরিত্রই। তিনি কোন বিশেষ গোষ্ঠি ভুক্ত সাহিত্য রচনায় তেমন উৎসাহী নন। হৃদয়ের ইঙ্গীতে তিনি লেখেন ও নিজের মতামতের ওপর স্থির বিশ্বাসী সেখান থেকে তিনি এক চুল নড়তে চান না। তবে আমার মনে হয় তাঁর কয়েকটি লেখা কালজয়ী হয়ে থাকবে।

আবদুল আউয়াল

আউয়ালকে পাই আমার ছাত্র হিসাবে ১৯৪৮ সনে। ঢাকা কলেজেই। তার ছাত্র জীবনে অনেক বাধা বিপত্তি থাকায় সে রীতিমত পড়াশুনা করতে পারেনি। তাই বেশী বয়সে কলেজে পড়তে এসেছিল। রাজনীতিতে চেতনাবান যুবক, তাকে আমার ভালই লাগত; তবে অতি মাত্রায় রাজনীতি করায় তার পড়াশুনা তেমন হোত না। অনেক বছর পর তাকে আদমজি মিলের কর্ণধার হতে দেখি। তখন সে রাজনীতি করত না এবং পোষাক পরিচ্ছদেও অনেকটা অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল। কুর্তা, পাজামা ও আচকান ছেড়ে তিন পিস সুট পরত। পয়সা কড়ির অভাব তার জীবনে প্রথম অবস্থায় ছিল, শেষের দিকে তা ছিল না। অনেক ধনের অধিকারী হয়েও সে এক রহস্যজনক মৃত্যুর শিকার হয়। আমার বহু ছাত্রদের মধ্যে সে এক বিচ্ছিন্ন চরিত্র।

প্রফেসর সিরাজুর রহমান

সিরাজুর রহমানকে পাই ১৯৫৩ সনে রাজশাহী সরকারী কলেজে। তিনি ছিলেন ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক ও আমি তখন সেই বিভাগেই। উর্দুতে যাকে বলে "খোস আখলাখ" তার অধিকারী ছিলেন তিনি। অত্যান্ত অমায়িক ও সদালাপী, তবে ইংরাজী ভাষায় প্রতি তাঁর একটা দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি চেষ্টা করে সহজ শব্দ বাদ দিয়ে কঠিন ও অপ্রচালিত ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে আনন্দ পেতেন। কোন কোন সময়ে এমন সব শব্দ ব্যবহার করতেন যার অর্থ বোঝা ডিক্সনারী ছাড়া সম্ভব হোত না। একবার দেশ বরণ্য সহিদ সরওয়ার্দ্দি সাহেব কলেজ পরিদর্শন করতে এলেন। Wel come Address সিরাজুর রহমান সাহেব রচনা করে ছিলেন। পাঠ করার পর সরওয়ার্দ্দি সাহেব বললেন "আমার মনে হয় আমার সম্বন্ধে বেশ কিছু ভাল কথা বলা হয়েছে, তবে সব তেমন বুঝতে পারিনি"। সিরাজুর রহমান সাহেব ছিলেন একটা যুগের ছবি, যখন পড়াশুনা ও পাণ্ডিত্য শিক্ষকের জীবনের একটা প্রধান উপকরণ ছিল। সারাদিন কলেজে থাকতেন, ক্লাশ থাকুক আর না থাকুক। চুপ চাপ একটা বই নিয়ে বসে থাকতেন এবং সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরতেন না। ইংরাজী ভাষার ওপর তাঁর বেশ দখল ছিল এবং তাঁর সান্নিধ্যে আমি বেশ উপকৃত হয়েছি। চাটগা তাঁর বাড়ী ছিল। বাড়ী যেতেন না তবে মাসের পয়লা সপ্তাহে একটা Money order

পাঠাতেন নিয়মিত। এই আত্মভোলা পণ্ডিত শিক্ষক আজ অনেক দিন অবসর গ্রহন করে চাটগাঁতেই আছেন।

মোসলেহ উদ্দিন

১৯৪৮ সনে মোসলেহ উদ্দিন-কে পাই আমার ছাত্র হিসাবে ঢাকা কলেজে। সে Commerce পড়ত ও চমৎকার গান গাইতে পারত। College function-এ তার প্রাধান্য ছিল গানেই। নিজে ইংরাজী গান রচনা করে সুর দিয়ে তাকে গাইতে শুনেছি। সেই সময়ে আমি নিজেও গান গাইতাম ও তাকে গান গাইতে উৎসাহ দিতাম। বেশ কয়েক বছর পর সে এম, কম পাশ করে তবে কোন চাকুরীতে যোগ না দিয়েই গান নিয়েই মেতে থাকে। ১৯৬০ এর দিকে আমি একবার লাহোর যাই। আশ্চর্য্যজনক ভাবে তার সাথে দেখা হয়ে গেল। সে তখন একটা ছবির সংগীত পরি-চালক। আমাকে স্টুডিওতে নিয়ে গেল ও বলল "স্যার আপনার উৎসাহ আমার জীবনে অনেক কাজে লেগেছে"। বর্তমানে সে ইংল্যাণ্ড-এ বসবাস করেছে বলে শুনেছি, তবে তেমন আর গান গায় বলে শুনিনি।

আসকর আলী

প্রফেসর আসকর আলীকে আমি পাই ১৯৪৯ সনে ঢাকা কলেজের ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক রূপে। তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার ও Anglo saxon English-এ তাঁর আধিপত্য ছিল। কারণ Anglo saxon literature-এ তাঁর একটা বিলেতী degree ছিল। পাতলা গড়ন, একটু খিটখিটে মেজাজ ও বেশীর ভাগ সময়ে কালো রং এর তিন পিস স্যুট ও বোটাই পরতেন। হাইকোর্টে তেমন জমেনি তাই শিক্ষকতায় তিনি নিজকে নিয়োজিত করে-ছিলেন। তিনি সেই সময়ে বোধহয় ১৯৫১ সনে কিছু দিনের জন্য ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও কাজ করেছিলেন। আমি নূতন লেক-চারার, তাঁর থেকে একটু দূরেই থাকতাম। তাঁর একটা মজার অভ্যেস ছিল। হয়ত আমার সাথে কলেজ ছুটির পর কোন দোকানে দেখা হোল। বিনা Introduction ও reference ছাড়াই জিজ্ঞাস করে বসলেন, "আচ্ছা ৭ নম্বর answer-এ এত কম নম্বর কেন দিয়েছেন? দোকানে সাবান কেনার সময় এমন প্রশ্নের অবতারনায় বেশ আমোদ পেতাম। ১৯৫২র ভাষা আন্দোলনে আমরা ঢাকা কলেজের সব শিক্ষক, একযোগে চাকুরীতে ইস্তাফা দেই। তাঁকে যখন আমরা ইস্তাফা দিতে অনুরোধ করি, তিনি হাউমাউ

করে বলে উঠলেন "পেনশনের মাত্র কিছু দিন বাকী এখন ইস্তাফা কি করিয়া দেই। কিন্তু যখন জানলেন সিদ্দিক বাজারের কিছু Patriot ছোকরা ডেগার নিয়ে গেইটে দাঁড়িয়ে, তখন অনেকটা মোলায়েম হয়ে বললেন "ইস্তাফা দিলে কোন অসুবিধা হবে না'ত"।

তবে তাঁর অন্তর বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ও মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাশায় ও যোগ দিতেন আমাদের সাথে। ১৯৫২-র দিকে ডঃ জুবেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর প্রধান ছিলেন। আমি কিছু দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে Part time অধ্যাপনা করি। Anglo saxon paper-এর moderation নিয়ে কথা উঠলে আসকার আলী সাহেব বল্লেন "আমি ছাড়া কেউ ত ওটা moderate করতে পারবে না"। ডঃ জুবেরী বল্লেন "প্রফেসর আলী, we also know little bit of old English & we may with your permission have a go. Azhar & myself will try" আত্মভোলা অনেকটা ছেলে মানুষের মত কথা বলতেন তিনি। আজ অনেক দিন অবসর গ্রহন করে ঢাকা শহরেই আছেন।

বাদশা মিয়া

এর সাথে পরিচয় হয় ১৯৫৫ সনে, লণ্ডনে, বোধহয় কোন বড় পরিবারের আদুরে ছেলে, লণ্ডনে হয়ত পড়াশুনা করতে এসে বিগড়ে গেছেন। দেশ সিলেটে। Gower Street ও Euston Road-এর Junction-এ তাঁর Resturent ছিল। নাম "নূরজাহান হোটেল" প্রায়ই সন্ধ্যার সময় তাঁর Resturent-এ আড্ডা দিতাম ও দেশী খাবার খেতাম। কফির দাম অনেক সময়ে নিতেন না। তার স্ত্রী এক ইংরেজ মহিলা ও তার দু'টি মেয়ে ছিল শীলা ও বারবারা। তারা Grammar স্কুলে পড়ত। বাদশা মিয়া মাঝে মাঝে খেদ করে বলতেন "প্রফেসর সাহেব আমাকে একটু ভাল ইংরাজী শিখিয়ে দেন, আপনি আমাকে একটু গ্রামার পড়ান"।

গ্রামার পড়ে কি করবেন। আপনিত বেশ ভাল ইংরাজী বলতে পারেন। গ্রামার ছাড়াই ত আপনার হোটেল ও সংসার ভালই চলছে।"

না স্যার শীলার মা মাঝে মাঝে কৌতুক করে। আমার ভাল লাগে না।।

নূরজাহান হোটেলে আমার অনেক বাঙ্গালী বন্ধু আসতেন, এদের মধ্যে আবু ইমাম (বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর) ও সাইফুর রহমানের (বাংলা দেশের প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী) কথা বেশ মনে পড়ে।

লণ্ডন ছেড়ে BRISTOL আসার সময় আমাকে তিনি একটা Dinner দেন এবং বিদায়ের সময়েও ঐ একই কথা" একটু যদি ভাল গ্রামার জানতাম"? আমি দেশে ফেরার পরও অনেক দিন চিঠি পত্র দিয়েছেন। আজ অনেক দিন তার খবর জানিনা। বোধহয় এতদিনে ইংরাজী গ্রামার তার রপ্ত হয়ে গেছে।

আলফ্রেড কোরাইয়া

এর সাথে ও পরিচয় ১৯৫৫-র দিকে লণ্ডনে। কোরাইয়া ছিল সাইপ্রাস এর অধিবাসী ও লণ্ডন-এ Tottenham Court Road-এর এক কোণায় তার Hair Cutting Saloon ছিল। ৩০ এর মধ্যে বয়স ও বেশ সৌখিন লোক। আলাপ কি করে জমে গেল জানিনা। মাসে একবার যেতুম তার সেলুনে। খুব বন্ধু বাৎসল ও গল্পবাজ ছিল এই কোরাইয়া। থাকত একা ও দু-তিন মাস অন্তর সাইপ্রাস যেত, বাড়ী থেকে আনত ফল-ফলারী ও শুটকি মাছ। তার মা'র হাতের তৈরী এক রকম Drygin-ও আনত। এক দিন জিজ্ঞাস করি---

"কোরাইয়া, তুমি একা লণ্ডন-এ পড়ে আছ কেন? তোমার দেশ ও ত বেশ উন্নত। সেখানে সেলুন করতে? কোরাইয়া জবাব দেয়---

"প্রফেসর তুমি বোঝ না। তুমি একেবারে বোকা। আমার Nicosia লণ্ডনের মত হতে ২০০ বছর লাগবে। আমি কি ২০০ বছর বাঁচব। তবে ২০০ বছর আগে যে সুখ ও সুবিধা আমি যখন এইখানে পাচ্ছি, তা ছাড়ব কেন?

অকাট্য লজিক। বেশ আমুদে লোক ছিল এই কোরাইয়া। মাঝে মাঝে ছুটির দিনেও three piece স্যুট পরে Top-Hat মাথায় দিয়ে, হাতে মলাক্কা কেইন-এর ছড়ি নিয়ে, লাল গোলাপ Button hole-এ গুঁজে সে বেড়িয়ে পড়ত। তখন মনে হোত Oscar wild-এর দ্বিতীয় সংস্করণ দেখছি।

Prof. L. C. Knights

Bristol University U.K. English Department-এর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৫ সনে তাকে আমার সুপার ভাইজার রূপে পাই। একজন বিখ্যাত Shakespeare Scholar ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী অথচ শিশুর মত সরল। থিসিসের অগ্রগতি তেমন হচ্ছে না। মন বিষণ্ণ, চুপ-চাপ বসে আছে লাইব্রেরীতে আমার রুমে। রাত্রি প্রায় ৮টা। দেখি Knights

সাহেব ধীরে ধীরে কখন যে এসে আমার বিরাট টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে। ঝটপট উঠে দাঁড়াই। তিনি বলেন "Mr. Hussain, I can hardly see you through the Chinese wall of books". বলে হাসতে থাকেন। থিসিস সম্পর্কে কোন কিছু বলতে চাইলে তিনি বলেন "Leave that! We have a fine Summer this year. Do you enjoy our Summer; by the way? Have you any girl friend"? অনেক সময় কাটিয়েছি তার সাথে। Official discussion মাসে দু'বার ছাড়াও, সময়ে অসময়ে তাঁর দ্বারস্থ হয়েছি। সব সময়ে উৎসাহ দিতেন। কোন Point of discussion তাঁর ভাল লাগলে শিশুর মত আনন্দ পেতেন ও বলতেন Prof, Hussain you have made it কোথায়ও কোন দাড়ি, কমার ভুল হোলে হেসে বলতেন "Our's is a very funny language; it compels you to be more careful". অনেকবার তাঁকে নিষেধ করেছি আমাকে প্রফেসর সম্বোধন করতে সেই সম্বধনে অনেকটা লজ্জা পেতাম, তবুও তিনি আমাকে ঐ ভাবেই ডাকতেন। তবে মাঝে মাঝে আজহার ও বলতেন।

মৌখিক পরীক্ষার পর অফিসিয়ালি ফল বেরবার আগে অনেকবার ফোন করে জ্বালাতন করেছি তাঁকে। একদিন দেখি একটা কার্ড এসেছে। তাতে ছোট করে লেখা "Congratulations, Knights".

যেদিন Bristol ছেড়ে দেশে ফিরি, তাঁর সাথে বিদায়ের আগে দেখা করতে যাই। মুখে পাইপ, পড়ার ঘরে বসে লিখছেন। বল্লাম "স্যার পরশু আমার জাহাজ লিভারপুল থেকে ছাড়বে"। হঠাৎ আনমনা হয়ে চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন "তোমরা যাত্রা শুভ হোক"। সাবধানে যেও, আর হ্যাঁ আমার সাথে একটা Cocktail খেয়ে যাও। Hand shake করতে হাত বাড়ালে অনেকক্ষণ ধরে রইলেন আমার হাত। তাঁর হাতের উষ্ণতায় হৃদয়ের ছোঁয়াচ পেলাম। পরে ধীরে ধীরে হাত ছেড়ে মুখে বললেন "Look after yourself, Azhar, God bless you. Have you enough money with you" বল্লাম হ্যাঁ স্যার। রুমালে চোখ মুছে তার wood land Park বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। ১৯৫৮ এর পর তাঁর সাথে আর দেখা হয়নি। Prof. Kinghts অনেক দিন হয় অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে কেম্ব্রিজে বসবাস করেন এবং আজোও আমার খোঁজ খবর নেন। প্রতি বছরই বড় দিনে এর সময়ে তাঁর একটা Greeting Card পাই।

সামছুল হক সাদানী

সামছুল হকের সাথে আমার পরিচয় ১৯৫২ এর দিকে রাজশাহী সরকারী কলেজে। তিনি উদ্দুর শিক্ষক ও ভাল উর্দ্দু কবিতা লিখতে পারতেন। বয়সে তারতম্য থাকলেও কেন জানিনা আমার সাথে পরিচয় খুব গাঢ় হয়। বিহার সাসারামে বাড়ী—বিয়ে পাবনায় ও চাল চলনে কিছু কিছু মাজ্জিত ইংরাজী কেতা নকল করায় উৎসাহী।

১৯৫৬ এর দিকে এডিনবড়ায় যান ও সেখানে শিক্ষার ওপর ডিগ্রী করেন। যাবার পথে লণ্ডনে বেশ কয়েক দিন ছিলেন ও সেই সময়ে আমার Gower Street-এর বাসায় আসতেন। নিষিদ্ধ এলাকা, মসজিদ, গীর্জাসহ অনেক দ্রষ্টব্য স্থান তাঁর সাথে পরিভ্রমণ করেছি। ইংলণ্ড প্রবাসের পর দেশে ফিরেন মোটর কারে নিজে চালিয়ে এবং অনেক দিন পরে Through the Car window ভ্রমণ কাহিনী লিখেন। রুচি অভিজাত কথা বার্তায় মিষ্টি, মন সাহিত্যিক ভাবাপন্ন, তবে খরচের ব্যাপারে হিসেবি, সামছুল হক বেশ আলাপী। আজ বেশ কয়েক বছর Deputy Director of Education হিসাবে অবসর নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন৷

ইংরাজীতে যাকে বলে wit সামছুল হকের মধ্যে তা বেশ আছে ও তাঁর সদব্যবহার আমাকে আনন্দ দিত। এখনও তার wit তেমন ভোঁতা হয়ে যায়নি তবে জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে অনেকটা অবসন্ন। ইংরাজী চালচলন ও কৃষ্টির প্রতি আসক্ত সামছুল হক মনের দিক দিয়ে পুরান মোগল ঐতিহ্যে আস্থাবান। এ-দুটোর সমন্বয় তাঁর মধ্যে দেখা যায় যেমন ঈদের চাঁদ দেখে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা ও Happy New year's-এর কার্ড পাঠান।

হেলমুট সিমারমান

১৯৫৬-র দিকে Bristol-এ তার সাথে আমার পরিচয়। Bristol Language Tution Institute-এ আমি কিছু দিন ইংরাজী পড়াতাম ও সেই সময়ে এই জার্মান সিমারমান আমার কাছে ইংরাজী শিখত। পরিচয় বেশ নিবিড় হয়েছিল ও সে প্রায়ই আমার কাছে আসত। বিকালে প্রায়ই এক সাথে বেড়াতাম। তার একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। কোন জিনিষ দেখলে সে তার খুটি নাটি জিজ্ঞাস করত। যেমন Bristol Clifton Suspension Bridge দিয়ে যাচ্ছি, সে জিজ্ঞাস করত।

Bridge-টা কত লম্বা-চওড়া কত, কে তৈরী করেছে? লোহাগুলো কি বেশ শক্ত? এটা ভাংতে কত সময় লাগবে?

অথবা কোন মাঠ বা বস্তি দেখলেঃ

মাঠের সাইজ কত? মাঠে কতগুলো ক্যাম্প? হতে পারে। সেনানীর খাবার কি এই বস্তিতে পাওয়া যায় ইত্যাদি।

একদিন বলি 'সিমারমান তোমার এ অভ্যাস খুব খারাপ। ইংরাজরা এত খুটি নাটি জিজ্ঞাসা করা পছন্দ করে না। মনে রেখ কোন জিনিসের দাম জিজ্ঞাস করা etiquitte-এর বাইরে।

তার জবাব

"প্রফেসর তুমি জান না। এসব জিজ্ঞাস করার আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

কি?

"ধর এখন না হয় ইংরাজদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব। তবে যদি ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাঁধে, আমি বিমান বাহিনীতে পাইলট হয়ে এই সব জায়গা Bomb করব।"

কি মহান উদ্দেশ্য। ইংরাজী ভাষা শিখে নিয়ে ইংল্যাণ্ড এ বোমা ফেলবে। তবে এমনিতে মন তার বেশ সরল ও সবার প্রতি বেশ শ্রদ্ধাশীল। খুব পরিশ্রমী ছিল সে। আমি দেশে ফেরার পর বেশ অনেকদিন চিঠি পত্র দিয়েছে। তার শেষ চিঠিতে জানি সে Baden Baden-এ কোন ও Engineering Institute এ Instructor হয়েছে। অনেক দিন লেখে না।

লুৎফুল হক

লণ্ডনে ১৯৫৪-তে প্রথম পরিচয়। একই বাড়ীতে Gower Street-এ থাকতাম। S. O. A. S-এ আরবীতে রিসার্চ করতেন। দেশ নোয়াখালী তবে বেশ ইয়োরোপিও, সদালাপী ও ইংরাজী সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নিজ হাতে চমৎকার রান্না করতেন। Shrimp ও Butterbean ও মাঝে মধ্যে আমাকেও রান্না শিখিয়েছেন। ইংরাজদের জাতীয় pet কুকুর তেমন ভাল বাসতেন না। এবং এ জন্য অনেক ইংরাজ পরিবারে-তে আতিথেয়তার দাওয়াতে যেতেন না। পাছে কুকুর তার জামা কাপড় নাপাক করে দেয়। অনেক দূর হেঁটে হয় মুসলমান কসাই নয় ইহুদির দোকান

থেকে গোস্ত কিনতেন। লণ্ডন এর লালবাতি এলাকা সম্বন্ধে উৎসাহী তবে নিজে যেতেন না। উৎসাহ দিয়ে যদি বলতাম।

"হক সাহেব এ-এও-ত অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা অর্জনে-ত পাপ নেই"।

"না যদি কেউ দেখে ফেলে" শিশুর মত সরল লুৎফুল হক। পরে অনেক দিন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। আমরা এক সাথে অনেক দিন রাজশাহী সরকারী কলেজে কাটিয়েছি বর্তমানে তিনি অবসর নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত।

গৌর বাবু

গৌর বাবু ছিলেন, আসলে পিয়ন, রাজশাহী সরকারী কলেজ লাইব্রেরীর তবে আমার মনে হয় লাইব্রেরীয়ান হলেও তাকে মানাত। আমার সাথে পরিচয় ১৯৫২-তে। পড়াশুনা অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত।। তবে লাইব্রেরীর প্রায় অধিকাংশ বই-এর নাম ও গুণাগুণ জানতেন। বই এর Call Number ও Shelf No তার মুখস্থ এবং ছাত্র ছাত্রীদেরকে প্রচুর তথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন।

"গৌর'দা Comedy-র ওপর কোন বই বা পড়ব" Thorandyke পড় না Call No. 202 D, Shelf No 42.

আবার হয়ত কোন ছাত্রের প্রশ্ন "Political Science"-এর কোন বই ভাল? Gilchrist পড় Call No. 52 F. Shelf No. 69 !সারাদিন লাই-ব্রেরীতে থাকতেন, রাত করে বাড়ি ফিরতেন। এমন Devoted Library Peon দেখেনি। সামান্য বেতনে কাজ করতেন। কোন অভিযোগ ছিল না তার। অনেক দিন দেখা নেই। শুনেছি তিনি বেঁচে নেই।

সৈয়দ আলী আহসান

চল্লিশের দশকের কবি আহসান ভাই, ইংরাজী পড়তেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ে-তে আমার দু'বছর ওপরে। তাঁর ছোট ভাই আলী আশরাফ আমার সহপাটি, তাঁর সাথে পরিচয় ১৯৪২ সন থেকে, যখন আমি ও আশরাফ ঢাকা কলেজে পড়ি। আহসান ভাই ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় থাকেন, অনেক দিন অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর চাকুরীতে, তার পর করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী, চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও শেষে জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগ দেন। মধ্যে দু'বার ভাইস-

চ্যান্সেলর ও একবার মন্ত্রী হোন। নিজে পড়েছেন ইংরাজী তবে সারা জীবন পড়িয়েছেন বাংলা। এ যেন এক অদ্ভুত Linguistic revenge রাঁধেন ভাল ও মুখরোচক খাবারের প্রতি প্রচুর লোভ। আলাপী তবে তাঁর আলাপচারীতে একটা সূক্ষ্মতার ছোঁয়াচ থাকে আর থাকে wit-এর প্রাচুর্য্য, যা-তার আলাপের বিষয়-কে পরিশোধিত করে। অনেক কঠিন বিষয়-কে সহজ করে অনেকটা হাসির পর্য্যায় নামিয়ে আনতে পারেন। মাঝে মধ্যে স্যুট পরেন বিশেষ করে শীতের দিনে আর আমার সর্ব্বকালীন স্যুট পড়া নিয়ে বলেন Suit in Azhar's Second Skin "
"বলি" ও'টাত চাকুরীর dignity বজায় রাখতে। স্যুট পরে 'ত গোসল করি না"। পূর্ব বাংলার প্রতি গভীর অনুভূতিশীল আহসান ভাই বর্তমানে অবসর নিয়ে ঢাকায় থাকেন।

আবদুল মালেক

ডাক নাম 'গেদা'। আমাদের বাড়ীতে চাকুরী করতে আসে যখন আমার বয়স ৬ কি ৭ বছর। তার বয়স ও ১২।১৩-রে বেশী নয়। আমাকে নিয়ে সময় কাটান ও খেলা ধূলা করাই ছিল তার প্রধান কাজ। আমাকে কোলে পিঠে নিয়ে ঘুরত আর রোজ রোজ নূতন রকমের সব খেলা আবিস্কার করত। তার ওপর হুকুম ছিল আমাকে নিয়ে যেন বাড়ী থেকে বেশী দূর না যায়। একদিন মাছ ধরার ব্যাপারে আমাকে প্রলুব্ধ করে ও নিজে ছিপ ইত্যাদি তৈরী করে কাছেই কোন এক পুকুরে যায় আমাকে নিয়ে। আমি পাড়ে বসে থাকি ও সে বর্শীটা ফেলে মাছ ধরে। বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেলে আমি বলি 'গেদা' চল বাড়ী যাব।

বলে 'আর একটু সবুর করেন---এই কৈ মাছটা ধরি"।

ঘন্টা চা'রেক পর বাড়ী ফিরি ও একটা কৈ মাছ মেরে আমাকে শেখায়---

"মিয়া আম্মারে বলবেন গেদা যে মাছ মারছে ঐ মাছ দিয়া ভাত খামু কেমন?

পাছে ভুলে যাই, বার বার আমাকে এই সবক পড়ায়। কিন্তু বাড়ী ফিরে শেষ রক্ষা হলো না। গেদা দু'চারটা চড়-চাপড় ও আমি ধমক খেলাম প্রচুর।

বড় আপন হয়ে গিয়েছিল গেদা। প্রায় ১০।১২ বছরও আমাদের বাড়ীতে কাজ করে ও পরে চলে যায় কলকাতায়। ১৯৫২।৫৩-র দিকেও

আমাদের বাসায় ঈদে, বখরী ঈদে আম্মাকে সালাম করতে আসত। ঢাকায় একটা মাঝারী রকমের হোটেল দেয়। প্রায়ই এটা ওটা নিয়ে আসত। ১৯৬২-র দিকে আমাদের এই অতি আপনজন পুরাতন ভৃত্য হঠাৎ মারা যায়।

বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী

১৯৩৬র দিকে বিজয়কে পাই আমার Class mate হিসাবে, East Bengal Institution স্কুলে। বিজয় ক্লাশে বরাবরই আমার চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে যেত। গানের গলা ছিল ভাল ও বেশ গান করতে পারত। বাড়ী ছিল বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামে। মাঝে মাঝে দেশে যেত ও ফিরে এসে নানা রকমের অলৌকিক গল্প কাহিনী বলত। যদি তার গল্পে বর্ণিত অশরীরীদের সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতাম, তখন বলত "পড়ে দেখিস এই সব কথা বেঁদে আছে। হ্যাঁ বেদে এমন একটা জিনিষ ২০০০ বছর আগে সব বলে রেখেছে।" জানিনা তার বাড়ীতে বোধহয় একটা ধর্মীয় আবহাওয়া ছিল যার জন্য এই রকম বলত। এম, এ, পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ও পরে ১৯৪৭ এর দিকে কলকাতা চলে যায়---ঢাকার বাস তুলে। বর্তমানে কলকাতায় Indian Coal miners Association-এর Secretary। বাংলাদেশে হবার পর একবার ঢাকায় এসে তার পুরান দেশ বাড়ী দেখে এসেছে। খুব আপন হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই চিঠি দেয় ও সংবাদ নেয়। ঢালও নিমন্তন থাকা সত্বেও এ পর্যন্ত কলকাতা গিয়ে তার সাথে দেখা করতে পারিনি। মনটা খুব স্বচ্ছ ও হিন্দু---মোসলেম বিরোধের মধ্যেও বন্ধুতে কোথাও ভাটা পড়েনি। ১৯৪০ এর দিকে তাদের বাড়ীতে ঢাকায় বিখ্যাত সংগীত শিল্পী গৌরিন চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তার ছোট ভাই কেচু চক্রবর্তী ও আমাদের সাথে পড়ত। অনেক দিন কেচুর ও খবর জানিনা। কেচু অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রে প্রোগ্রাম করত ও মাঝে মাঝে বড় মজার ইংরাজী বলত "কেচু গতকাল সন্ধ্যায় নবাবপুর রোডে একটা মেয়েকে তোমার সাথে দেখলাম। মেয়েটা কে"?

চটে গিয়ে কেচু বলে "Does not know. Does you no him? him-এর জায়গায় "her" হবে। তবে বাকী ইংরাজী কেচুর নিজস্ব।

গিসেলা থিবো

সম্ভ্রান্ত জার্মান পরিবারের মেয়ে। পরিচয় হয় প্রথম লণ্ডনে ১৯৫৪ এর দিকে। কলোনে এক স্কুলে ভূগোল পড়াত ও লণ্ডনে এ ছুটি কাটাতে

আসে। বয়স ২৫/২৬। Flying Scotsman-এ লণ্ডন থেকে এডিনবরা যাচ্ছিলাম একই Compartment-এ। অনর্গল কথা বলে ও ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীলা। পরিচয় জমে উঠল। বছর খনেক পর যখন আমি বৃষ্টলে তখন হঠাৎ তার সাথে আবার দেখা। বলল "ছুটি নিয়ে ইংলণ্ডে আবার এসেছি ভৌগলিক তথ্য সন্ধানে। তবে ইংরাজী ভাষায় কিছুটা কাঁচা-ওটা ঠিক কর্ত্তে হবে। তাই Language Institute-এ ভর্তি হয়েছি।

চমৎকার German folk song গাইতে পারত আর আরোও ভাল বাজাত গীটার। প্রায়ই আমার সাথে University Union night-এ যেত ও অনেক প্রোগ্রাম এ অংশ নিত। তাকে নিয়ে মজা ও হোত মন্দনা। ভুল ইংরাজী অসংকোচে অনর্গল বলায় ছিল অদ্বিতীয়। Avon নদীতে Motor Launch-এ বেড়িয়ে এসে আমার এক বন্ধুকে বলছে "Me & Azher went down into the river for enjoyment trip of Motor Launch in a excellent way into the refreshing water.

সদা হাস্যময়ী গিজ্‌লা কখনও Serious হতে দেখিনি---একবার ছাড়া। একদিন এল, হাতে তার একটা টেলিগ্রাম। আমাকে টেলিগ্রাম টা দিল। তার বাবার মৃত্যু সংবাদ। চেয়ে দেখি তার চোখ থেকে এক ফোটা জল তার কব্জি ঘড়িটার কাঁচে পড়ে থর থর করে কাঁপছে। তবে ঠোঁটে সেই হালকা হাসির রেশ। বলুল "তোমার সাথে পাকিস্তান যেতে চেয়েছিলাম। বাবা ত চলে গেল। মা আর ছোট ভাই কে দেখবার কেউ নেই। কোলোনে ফিরে যাব---তবে বৃস্টল আর তোমাকে ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হবে।"। দেশে গিয়ে অনেক দিন খবরা খবর নিত। ৮।১০ বছর তার খবর জানিনা। ব্যাচারী গিজলা।

সুলতান

চিটাগাং গভর্ণমেণ্ট কলেজ এ যখন আমি ইংরাজী বিভাগের অধ্যক্ষ, সুলতানকে পাই আমার বিভাগে বেয়ারার রূপে ১৯৬৩ সনে। বয়স প্রায় ষাট, শক্ত দেহ, নিরলস কর্মি ও অত্যন্ত আদব কায়দা দুরস্ত চাপরাশী। আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন একজন চোখে পড়েনি। খাটি চাটগায়ে লোক, পরহেজগার ও প্রথম জীবনে প্রায় ১৫ বছর বর্মায় কাটিয়ে এসেছে। বার্মিজ মেয়ে বিয়ে করেছিল তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্ত্রী মারা যাওয়ায় সেই যে রেঙ্গুন ছেড়ে এসেছে আর যায়নি। কাজে কর্মে এমন প্রভুভক্ত লোক খুব কম দেখেছি।

"সুলতান চিঠি ফেলতে এত দেরী করলে কেন"?

আঁই বড় পোস্টাপিসে দিয়ে আলাম। তাড়াতাড়ি যাবে"।

কখনও কখনও প্রিন্সিপাল-এর অবর্তমানে আমাকে প্রিন্সিপাল এর দায়িত্বে থাকতে হোত, সেই সময়ে সুলতান দু'মাইল দুর আমার Mehdibag flat থেকে আমার দুপুরের খাবার নিয়ে আসত।

"এত দেরী হোল কেন খাবার আনতে"? রিকসার পয়সা দিয়েছি। রিক্সায় এলো না কেন?

"আঁই খুব তাড়াতাড়ি আসছি। রিক্সা পাইতে দেরী হইছে। বাবুর্চি খানা দিতে দেরী করছে সাব"।

বুঝতাম রিক্সার একটা টাকা ভাড়া বাঁচিয়ে এই দুপুর রোদে পায়ে হেঁটে এসেছে। বকাবকি করতাম, তবে সব কিছু বড় সহজে গ্রহণ করত।

আমি যেদিন চাঁটগা কলেজ থেকে বদলি হয়ে ঢাকায় আসি, তার সে কি কান্না, আমাকে দাওয়াত দিয়ে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। যেয়ে দেখি এক বিরাট ব্যাপার করেছে। বিদায় নেবার সময় আমার পা ধরে সালাম করতে গেলে বল্লাম "সুলতান এই নাও ৫০ টাকা কিছু কেনা কাটা কোরো--আর শরীরের যত্ন নিও"।

স্যার আপনার লাগি আমার পরান পুরিব "বলে" ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল। চোখের জলের ধারায় আমি আসল সুলতানকে দেখলাম। চাপরাশী সুলতান, আমার ফরমাস যোগানকারী সুলতান সব ছাপিয়ে মানুষ সুলতানকে দেখলাম। ১৯৬৮ র পর আর দেখা হয়নি। তবে কয়েক বছর হয় আমি চিটাগাং কলেজে একবার গিয়েছিলাম। খোঁজ নিয়ে শুনি সে ৩।৪ বছর হয় মারা গেছে ও তার এক ছেলে বর্তমানে চাপরাশী। তার ছেলের মুখে শুনলাম যে সুলতান মাঝে মধ্যে প্রায়ই আমার কথা অনেক বলত ও সযত্নে রাখা বুক পকেট থেকে বার করে আমার ছবি দেখাত।

স্মৃতি মানুষকে দেয় বেদনা ও আনন্দ। এই বেদনার মধ্যে একটা আনন্দ থাকে, যা মানুষ ধরে রাখতে চায়। সব ঘটনা ইতিহাসে স্থান পায় না, না পেলেও অনেক সাধারণ লোক বা ঘটনার মধ্যে অসাধারণত্ব থাকে। শুধু দেশ জয় করলেই মানুষ অসাধারণ হয় না, হৃদয় জয় করা, দেশ জয় করার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ। অস্ত্র থাকলে দেশ জয় করা যায়, তবে

হৃদয় না থাকলে হৃদয় জয় করা যায় না এবং এই হৃদয় যার আছে, তার আনন্দ বেশী, দুঃখও বেশী।

আমার এই সামান্য স্মৃতি-চারণে কথা প্রসঙ্গে যাদের কথা এসে গেল, তারা এমন কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নন, তবে অসাধারনত্বের আলোক তাদের মাঝে দেখেছি এরা এবং আরোও অনেকে আমার চলার পথকে করেছে রঙ্গিন ও আনন্দময়।

পরিশিষ্ট

ইষ্টবেঙ্গল ইনসটিটিউশন

ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালিত এই স্কুল ১৯১৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় স্বনামধন্য জমিদার রায় বাহাদুর রেবতী বাবু এই স্কুলের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন।

ঢাকা কলেজ

১৮৪১ সনে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী সম্মান, এম, এ, ও আইন পড়ান হোত। ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই কলেজের অধিকাংশ বই ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত হয় ও Hons. M. A ও Law বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে ঢাকা কলেজ বহুদিন Intermediate কলেজ হিসাবে অবস্থান করে এবং ১৯৫০ সন থেকে আবার ডিগ্রী কোর্স খোলা হয় ও পরে সম্মান কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এই উপমহাদেশের প্রথম বাঙ্গালী মুসলমান ১৮৬১ খৃঃ এই কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। তাঁর নাম দেলওয়ার হোসেন আহমদ। তাঁর বাড়ি ছিল হুগলী জেলায়। অনুরূপ সময়ে কুমিল্লা জিলার নবাব সিরাজুল ইসলাম ও ঢাকা কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। সেই সময়ে মিঃ Brennand ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ঈদের মিছিল

ঢাকায় ঈদুল ফিতরের ও ঈদুল আজহার পরের দিন, একটা বেশ বড় ধরণের মিছিল বের করা হোত। এতে নানা রকমের ব্যঙ্গ-কৌতুক ও সাজ-সজ্জার ব্যাপার থাকৃত। জন্মাষ্টমী মিছিলের অনুকরণে এই মিছিল ও বেশ জাক-জমকের সাথে বের করা হোত। ১৯৫৩।৫৪ সনের পর এই মিছিল আর বের হয়নি।

মহররমের মিছিল

এটা এখনও বর্তমান। মহরমের চাঁদের ৮, ৯ ও ১০ এই তিন দিন এটা বের করা হয়। প্রধানতঃ ঢাকা শহরের শিয়ারা এর পৃষ্ঠ পোষকতা

করেন তবে সুন্নি মুসলমানেরাও এতে নানা ভাবে সাহায্য করেন ও অংশ-গ্রহণ করে থাকেন। ইমাম হাসানের কারবালা প্রান্তরে মৃত্যুবরণ এই মিছিলগুলোর প্রধান বিষয়বস্তু। ঢাকার হোসনী দালান থেকে এই মিছিল শুরু হয়ে পুরান ঢাকার কয়েকটি অঞ্চল ঘুরে আবার হোসনী দালানে যেয়ে শেষ হয়। মহররমের চাঁদের ১০ তারিখে এই মিছিল ভোর রাত্রে বের হয়ে বেলা ১০/১১ টার দিকে আজিমপুর অঞ্চল হয়ে ধানমণ্ডির ঈদগাহে যেয়ে শেষ হয়। এটাকেই কারবালার মিছিল বলে।

সাপ্তাহিক ঘোড়দৌড়

বর্তমানে যা সরওয়ার্দি উদ্যান, এটাই ছিল ঘোড় দৌড়ের মাঠ। এই ঘোড় দৌড় ইংরাজ আমল থেকে চলে আসছিল এবং এটার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ঢাকার জিমখানা ক্লাব। প্রত্যেক শনিবার এটা অনুষ্ঠিত হোত এবং অগণিত লোক এটা উপভোগ করত। অনেকে বাজি রেখে সর্ব্বস্বান্তও হোত, অনেকে আবার বাজি জিতে কিছু লাভবানও হোত। ঢাকার নাগরিক জীবনে ঘোর দৌড় একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ছিল। আনন্দ ও উদ্বেগের অপূর্ব সঙ্গমস্থল। বহু লোক রের্সের নানান বিভাগে চাকুরী করে দু-পয়সা রোজগারও করত।

১টার তোপধ্বনি

সময় সংকেত হিসেবে বেলা ১ টায় প্রত্যহ তোপ দাগান হোত। এই তোপখানাটি ছিল বর্তমান নূতন হাইকোর্টের সন্নিকট। বোধ হয় এই জন্যই এই পথটার বর্তমান নাম তোপখানা রোড। বৃটিশ আমলের শেষের দিকে এ'টি বন্ধ হয়ে যায়।

লাল চান্দ গোয়ালার মিছিল

ঢাকার মৈসুণ্ডি অঞ্চলে (নবাব পুরের পূর্ব দিকের এলাকায়) অনেক ঘর, গোয়ালারা বাস করতেন। "মৈসুণ্ডি" কথাটির অর্থ যেখানে "মৈসান" বা গোয়ালেরা থাকেন। এই এলাকা থেকে একটা মিছিল বের হোত লাল চান গোয়ালার স্মরণে। এই মিছিলে শহরের প্রায় সব হিন্দু দুধ বিক্রেতা ওয়ালা অংশগ্রহণ করতেন। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এই মিছিল বেরুত।

১৯৪০-এর পর এই মিছিল অনুষ্ঠিত হতে দেখেনি। এই মিছিলে বেশ কয়েকটা গোপ-গোপানির দল থাকত। তারা গান গেয়ে দুধের ভার নিয়ে অপরূপ সাজসজ্জা করে বেরুত। স্কুলে পড়ার সময়ে (১৯৩৬-৩৭) সনে এই মিছিল দু' একবার দেখেছি বলে মনে পড়ে। নবাবপুরের কাছে এখনও লাল চাঁদ-মকিম লেন বলে একটা রাস্তা লাল চাঁদ গোয়ালের স্মৃতি বহন করছে।

----০-----